দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অত্র**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **সর্গঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির বর্ণনা; **বিসর্গঃ**—উপসৃষ্টির বর্ণনা; **চ**—ও; **স্থানম্**—লোকসমূহের স্থিতি; **পোষণম্**—পালন; **উতয়ঃ**—কর্মবাসনা; **মন্বন্তর**—মনুগণের পরিবর্তন; **ঈশানুকথাঃ**—ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান; **নিরোধঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **আশ্রয়ঃ**—আধার।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ২ ॥

দশমস্য—আশ্রয়ের; **বিশুদ্ধি**—বিশুদ্ধভাবে; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য; **নবানাম্**—অন্য নয়টির; **ইহ**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **বর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করেছেন; **মহাত্মানঃ**—মহাপুরুষগণ; **শ্রুতেন**—বৈদিক প্রমাণের দ্বারা; **অর্থেন**—তাৎপর্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **অঞ্জসা**—সংক্ষিপ্ত রূপে।

অনুবাদ

দশম তত্ত্বে (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব নয়টি লক্ষণ মহাত্মারা বৈদিক প্রমাণের দ্বারা, কখনো বা সাক্ষাৎ বিশ্লেষণের দ্বারা, কখনো বা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

ভূত—আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **ধিয়াং**—মনের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **সর্গ**—প্রকাশ; **উদাহৃতঃ**—সৃষ্টি বলা হয়; **ব্রহ্মণো**—আদিপুরুষ ব্রহ্মার; **গুণবৈষম্যাৎ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের পরিণামবশত; **বিসর্গ**—পুনঃ সৃষ্টি; **পৌরুষঃ**—পরিণামস্বরূপ কার্যকলাপ; **স্মৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

ষোড়শ উপাদানের সৃষ্টি যথা—পঞ্চমহাভূত, (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন—এদের বলা হয় সর্গ। আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিসর্গ।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশটি লক্ষণ বিশ্লেষণ করার জন্য একাদিক্রমে সাতটি শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। তার প্রথম শ্লোকটিতে অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মন সহ মাটি, জল ইত্যাদি সৃষ্টির ষোলটি উপাদান বর্ণিত হয়েছে। তাকে বলা হয় সর্গ। বিসর্গ হচ্ছে আদিপুরুষ গোবিন্দের অবতার মহাবিষ্ণুর শক্তি এই ষোলটি তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার ফল, যা ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) পরে বিশ্লেষণ করেছেন—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মহাবিষ্ণু নামক গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, এবং তাঁর প্রতিটি রোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে উল্লেখ করা হয়েছে *শ্রুতেন* (বা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে), ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রভাবে জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই বৈদিক নির্দেশ

ব্যতীত এই সৃষ্টি জড়া প্রকৃতিজাত বলে মনে হয়। অজ্ঞানতাবশত মানুষ এধরনের সিদ্ধান্ত করে। বেদের নির্দেশ থেকে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে সমস্ত শক্তির (যথা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা) উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মায়িক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জড়া প্রকৃতি থেকে সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে দিব্যজ্যোতি, আর অবৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে জড় অন্ধকার। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, আর বহিরঙ্গা শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে সজীব হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির বিভিন্ন অংশ, যা বহিরঙ্গা শক্তির সংস্পর্শে ক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি।

এভাবে সর্গ বা আদি সৃষ্টি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান বা পরব্রহ্ম থেকে হয়, এবং গৌণশক্তি বা বিসর্গ সম্পাদিত হয় ব্রহ্মা কর্তৃক মূল উপাদানগুলির প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ শুরু হয়।

শ্লোক ৪

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম ঊতয়ঃ কর্মবাসনাঃ ॥ ৪ ॥

স্থিতিঃ—উপযুক্ত অবস্থা; **বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ**—বৈকুণ্ঠপতির বিজয়; **পোষণম্**—পালন; **তদনুগ্রহঃ**—তাঁর অহৈতুকী কৃপা; **মন্বন্তরাণি**—মনুগণের শাসনকাল; **সদ্ধর্ম**—আদর্শ ধর্ম; **ঊতয়ঃ**—কর্মপ্রেরণা; **কর্মবাসনাঃ**—সকাম কর্মের আকাঙ্ক্ষা।

অনুবাদ

ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ, তার নাম 'স্থিতি'; তাঁর ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, এর নাম 'পোষণ'; তাঁর অনুগৃহীত মনুদের ভগবদুপাসনার নির্দেশ স্বরূপ ধর্মই 'সদ্ধর্ম'; এই প্রকাশ ভিত্তিতে যে বহুবিধ কর্মবাসনা, তার নাম 'ঊতি'।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়, কিছু কালের জন্য পালন হয় এবং অবশেষে ভগবানের ইচ্ছায় তার বিনাশ হয়। সৃষ্টির উপাদানসমূহ এবং উপস্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি হয় বিষ্ণুর প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতারদের দ্বারা। প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পুরুষাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুতেই বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি পালন করেন। শিব হচ্ছেন ব্রহ্মার অনেক পুত্রদের মধ্যে একজন এবং তিনি জগতের ধ্বংসকার্য সম্পাদন করেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের মূল স্রষ্টা হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সৃষ্ট জীবদের পালন করেন। সেই সূত্রে প্রতিটি বদ্ধ

জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের বিজয় স্বীকার করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হয়ে দুঃখময় এবং সংকটময় এই জড় জগতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা। এই জড় জগতকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের স্থান বলে মনে করায় শ্রীবিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত বদ্ধ জীবদের প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি এবং বিনাশের চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন পাতাল লোক পর্যন্ত সব কিছুই বিনাশশীল। বদ্ধ জীবেরা তাদের সৎ এবং অসৎ কর্মের প্রভাবে আধুনিক অন্তরীক্ষ যানের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকে বিচরণ করতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যদিও বিভিন্ন লোকে আয়ুষ্কাল ভিন্ন হতে পারে। নিত্য জীবন লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যেখানে এই জড় জগতের মতো পুনর্জন্ম হয় না। বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবেরা এই সরল সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং তাই তারা এই জড় জগতে চিরকাল বসবাসের পরিকল্পনা করে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে তারা প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেকথা ভুলে গিয়ে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত হয়। মায়ার প্রভাবে এই বিস্মৃতি এতই প্রবল যে বদ্ধ জীব মোটেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায় না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের কারণে তারা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ হয় এবং শ্রীবিষ্ণুর কাছে ফিরে যাবার অপূর্ব সুযোগ স্বরূপ যে মানব জীবন তা অনর্থক অপচয় করে।

মনুগণকর্তৃক বিভিন্ন যুগ এবং কল্পে যে আদেশাত্মক শাস্ত্র রচিত হয় তাকে বলা হয় সদ্ধর্ম। তা মানুষদের সৎমার্গ প্রদর্শন করে, এবং তাই মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রকৃত কল্যাণ এবং জীবনের সফল সমাপ্তির জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা। এই জগৎ মিথ্যা নয়, তা হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কার্যকলাপ তা হচ্ছে আদর্শ মার্গ। যখন এই প্রকার নিয়মিত পন্থা অবলম্বন করা হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর ভক্তদের সর্বতোভাবে পালন করেন, কিন্তু অভক্তেরা তাদের কার্যকলাপের প্রভাবে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এই সম্পর্কে সদ্ধর্ম শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সদ্ধর্ম বা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কর্তব্য সম্পাদন হচ্ছে একমাত্র পুণ্যকর্ম; অন্যেরা পুণ্যবান হওয়ার অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পুণ্যবান নয়। কেবল এই কারণেই ভগবান ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়েছিলেন তথাকথিত সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হতে এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর জড় জাগতিক জীবনের সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে।

সদ্ধর্মে স্থিত হয়ে কর্ম করাই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ;এই অনিত্য জড় জগতে ভালো

বা মন্দ দেহ লাভ করে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হওয়াটা জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এইটিই হচ্ছে মানবজীবনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, এবং সেই অনুসারে জীবনের কার্যকলাপের আকাঙ্ক্ষা করাই উচিত।

শ্লোক ৫

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥ ৫ ॥

অবতার—ভগবানের অবতার; **অনুচরিতম্**—কার্যকলাপ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চ**—ও; **অস্য**—তাঁর; **অনুবর্তিনাম্**—অনুগামীদের; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ঈশকথাঃ**— ভগবত্তত্ত্ব; **প্রোক্তা**—বলা হয়; **নানা**—বিভিন্ন; **আখ্যান্**—বর্ণনা; **উপবৃংহিতা**—বর্ণিত।

অনুবাদ

শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত্র এবং তাঁর ভক্তদের নানাবিধ উপাখ্যান "ঈশকথা" বলে উক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতের স্থিতিকালে জীবের কার্যকলাপ লিখে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তির এবং কালের আখ্যান এবং ইতিহাস জানবার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাদের ভগবানের অবতারদের ইতিহাস অধ্যয়ন করার প্রবণতা নেই। সব সময় মনে রাখা উচিত যে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য। পরম করুণাময় ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতের বিভিন্ন লোকে অবতরণ করে বদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য লীলাবিলাস করেন। তার ফলে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তা যথার্থই পঠনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর মহান ভক্তদের বিষয়ে এই প্রকার দিব্য আখ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভক্ত এবং ভগবানের কাহিনী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

শ্লোক ৬

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

নিরোধঃ—জগতের লয়; **অস্য**—তাঁর; **অনুশয়নম্**—পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রায় শয়ন; **আত্মনঃ**—জীবেদের; **সহ**—সহিত; **শক্তিভিঃ**—শক্তিসমূহ; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অন্যথা**—পক্ষান্তরে; **রূপম্**—রূপ; **স্বরূপেন**—স্বরূপে; **ব্যবস্থিতি**—স্থায়ীপদ।

অনুবাদ

মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার পর উপাধিসহ জীবদের যে শয়ন, তার নাম "নিরোধ" ; মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপ পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম "মুক্তি"।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি যে দুই প্রকার জীব রয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিত্যমুক্ত, আর অন্যরা নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীবদের জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা থাকে, এবং তাই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে নিত্যবদ্ধ জীবদের দুই প্রকার সুবিধা প্রদান করার জন্য। তার একটি হচ্ছে বদ্ধ জীব তার প্রবণতা অনুসারে জড় জগতের উপরে আধিপত্য করার সুযোগ পায়, এবং অন্যটি হচ্ছে বদ্ধ জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। তাই জড় জগতের লয়ের পর অধিকাংশ বদ্ধ জীবই যোগনিদ্রায় শায়িত ভগবান মহাবিষ্ণুতে বিলীন হয়ে যায়, যাতে পরবর্তী সৃষ্টিতে তারা পুনরায় জন্মলাভ করতে পারে। কিন্তু কিছু বদ্ধ জীব বৈদিক শাস্ত্রের দিব্যবাণী অনুসরণ করার ফলে তাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীর পরিত্যাগ করে তাদের স্বরূপগত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন অবতারে ভগবান কর্তৃক প্রণীত শাস্ত্রের সাহায্যে জড় জগতের বদ্ধ জীব তার স্বরূপে পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সমস্ত অপ্রাকৃত শাস্ত্র পাঠ করার ফলে অথবা শ্রবণ করার ফলে জীব জড় জগতে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, এবং জীব যখন সেই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তৎক্ষণাৎ তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি হয়। জড় জগতের বদ্ধ জীবের যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ, তা তার অবিদ্যার ফল এবং যখনই সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এই ভক্তিই হচ্ছে সমস্ত রসের আধার স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দিব্য আকর্ষণ। সকলেই আনন্দ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু তারা কেউই সেই আনন্দের পরম উৎসকে জানে না। (*রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি*)। বৈদিক মন্ত্রে সমস্ত আনন্দের পরম উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে ; সমস্ত আনন্দের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে যখন কেউ তা জানবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে তাঁর প্রকৃত স্থিতিতে অবস্থিত হন।

শ্লোক ৭

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥

আভাসঃ—জড় সৃষ্টি ; **চ**—এবং ; **নিরোধঃ**—লয় ; **চ**—ও ; **যতঃ**—উৎপত্তি থেকে ; **অস্তি**—হয় ; **অধ্যবসীয়তে**—প্রকট হয় ; **স**—তিনি ; **আশ্রয়ঃ**—আধার ; **পরম্**—পরম ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম ; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা ; **ইতি**—এইভাবে ; **শব্দ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যাঁর থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং যাঁর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে অভিহিত হন। তিনি আশ্রয়—তিনি পরম সত্য।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে সমস্ত শক্তির পরম উৎস হচ্ছেন *"জন্মাদ্যস্য যতঃ, বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে,"* তিনি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান নামে অভিহিত হন। এই শ্লোকে *ইতি* শব্দটি প্রতিশব্দগুলির সমাপ্তি ঘোষণা করে *ভগবানকে* ইঙ্গিত করছে। পরবর্তী শ্লোকসমূহে তা বিশ্লেষণ করা হবে। কিন্তু এই ভগবান বলতে চরমে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।* সমস্ত শক্তির আদি উৎস অথবা পরম আশ্রয় হচ্ছেন পরম সত্য, তিনি পরম ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, এবং সেই পরম সত্যের চরম উপাধি হচ্ছে ভগবান। কিন্তু নারায়ণ, বিষ্ণু, পুরুষ ইত্যাদি ভগবান প্রতিশব্দেরও অন্তিম শব্দ হচ্ছে কৃষ্ণ, যে কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে* ইত্যাদি। আর তা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শব্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

(ভাঃ ১/৩/৪৩)

এইভাবে সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত শক্তির চরম উৎস, এবং কৃষ্ণ শব্দটির অর্থই হচ্ছে তাই। আর শ্রীকৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান বিশ্লেষণ করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে সূত গোস্বামী এবং শৌনক আদি ঋষিদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং এই স্কন্ধের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তার থেকেও অধিক স্পষ্ট। দ্বিতীয় স্কন্ধে পরম সত্য যে পরমেশ্বর ভগবান তা বিশেষ দৃঢ়তাসহ প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। চতুঃশ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্তসার, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত স্পষ্ট। ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।* সে কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই

বিষয়টির পূর্ণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম এবং একাদশ স্কন্ধে করা হয়েছে। মনু এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর, চাক্ষুষ মন্বন্তর আদি মন্বন্তরসমূহের পরিবর্তন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্কন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতেও শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অষ্টম স্কন্ধে বৈবস্বত মন্বন্তরের বর্ণনাতেও পরোক্ষভাবে সেই বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং নবম স্কন্ধের তাৎপর্যেও তাই। দ্বাদশ স্কন্ধে তা আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিশেষভাবে ভগবানের বিশেষ অবতার সম্বন্ধে। এইভাবে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের পর এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আশ্রয় বা সমস্ত শক্তির পরম উৎস। উপাসকদের স্তর ভেদে নারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদি রূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষিত হন।

শ্লোক ৮

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি ; **অধ্যাত্মিকঃ**—ইন্দ্রিয়যুক্ত ; **অয়ম্**—এই ; **পুরুষঃ**—পুরুষ ; **সঃ**—তিনি ; **অসৌ**—তা ; **এব**—ও ; **আধিদৈবিকঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ; **যঃ**—যা ; **তত্র**—সেখানে ; **উভয়**—উভয়ের ; **বিচ্ছেদঃ**—বিয়োগ ; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি ; **হি**—জন্য ; **আধিভৌতিকঃ**—দৃশ্যশরীর অথবা দেহধারী জীবাত্মা।

অনুবাদ

বিবিধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ, ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে বলা হয় আধিদৈবিক পুরুষ, এবং চক্ষুগোলকে দৃষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় আধিভৌতিক পুরুষ।

তাৎপর্য

পরম নিয়ন্ত্রণকারী আশ্রয়তত্ত্ব হচ্ছেন পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বলা হয়েছেঃ

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, আদি সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মারূপে বিভিন্ন প্রকাশ, যিনি তাঁর থেকে উৎপন্ন প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু তা হলেও আপাত দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে ভেদ রয়েছে। যেমন খাদ্য বিভাগের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি যার অবয়ব নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরই মতো একই উপাদান দ্বারা গঠিত। তেমনই জড় জগতে প্রতিটি ব্যক্তি উচ্চতর দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। যেমন আমাদের ইন্দ্রিয় রয়েছে,

কিন্তু সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি উন্নততর নিয়ন্ত্রক দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আলোক ছাড়া আমরা দর্শন করতে পারি না, এবং আলোকের পরম নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন সূর্য। সূর্যদেব সূর্যলোকে রয়েছেন, আর আমরা মানুষেরা অথবা অন্যান্য জীবেরা এই পৃথিবীতে রয়েছি, এবং আমাদের দর্শন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সূর্যদেবের দ্বারা। তেমনই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ উন্নততর দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁরা হচ্ছেন আমাদেরই মতো জীব, কিন্তু তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, আর আমরা নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত জীবদের বলা হয় *আধ্যাত্মিক ব্যক্তি*, আর নিয়ন্ত্রণকারীদের বলা হয় *আধিদৈবিক ব্যক্তি*। জড় জগতের এই সমস্ত পদ বিভিন্ন কর্মের ফলস্বরূপ লাভ হয়। যে কোন জীব সূর্যদেব অথবা ব্রহ্মা অথবা উচ্চতর লোকে যে কোন দেবতা হতে পারেন তাদের পুণ্য কর্মের প্রভাবে, এবং তেমনই নিম্নতর কর্মের প্রভাবে অন্য কেউ সেই সমস্ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইভাবে প্রতিটি জীবই পরমাত্মার পরম নিয়ন্ত্রণের অধীন, যিনি বিভিন্ন জীবেদের নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের পদে স্থাপন করেন।

যা নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিত জড় দেহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে, তাকে বলা হয় *আধিভৌতিক* পুরুষ। শরীরকে কখনও কখনও পুরুষ বলা হয়, যা এই বৈদিক মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—*'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ'*—এই শরীরকে বলা হয় *অন্নরসময়*। এই শরীর অন্নের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেহী জীবাত্মা কিছুই খায় না, কেননা দেহী হচ্ছে চিন্ময়। যন্ত্র স্বরূপ দেহের ব্যবহারাদির ফলে ক্ষয়বশত পদার্থের পুনঃ যোজনের প্রয়োজন হয়। তাই নিয়ন্ত্রিত জীব এবং নিয়ন্ত্রকারী দেবতাদের পার্থক্য *অন্নময়* দেহে। সূর্যের শরীর বিশাল হতে পারে, আর মানুষের শরীর ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান দেহ জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত ; কিন্তু তা হলেও সূর্যদেব এবং একজন সাধারণ মানুষ, যারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের সম্বন্ধে সম্পর্কিত, তারা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন চিন্ময় অংশ, এবং পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশদের বিভিন্ন পদে স্থাপন করেন। এইভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের আশ্রয়।

শ্লোক ৯

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

একম্—এক ; **একতর**—অন্য ; **অভাবে**—অনুপস্থিতিতে ; **যদা**—কেননা ; **ন**— করে না ; **উপলভামহে**—উপলব্ধি ; **ত্রিতয়ং**—তিন অবস্থায় ; **তত্র**—সেখানে ; **যঃ**— যিনি ; **বেদ**—জানেন ; **সঃ**—তিনি ; **আত্মা**—পরমাত্মা ; **স্ব**—স্বীয় , **আশ্রয়**—আশ্রয় ; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়ের।

অনুবাদ

জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সব কটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

জীবাত্মাসমূহ অসংখ্য, এবং নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্কে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনুভূতির মাধ্যম ব্যতীত কেউই বুঝতে পারে না কে নিয়ন্ত্রক এবং কে নিয়ন্ত্রিত। যেমন, সূর্য আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন; আমরা সূর্যকে দেখতে পাই, কেননা সূর্যের শরীর রয়েছে এবং আমাদের চক্ষু রয়েছে বলেই সূর্যের কিরণ আমাদের কাছে কার্যকর। আমাদের চোখ না থাকলে সূর্যের কিরণ অর্থহীন, এবং সূর্যকিরণ ব্যতীত আমাদের চক্ষুও অর্থহীন। এইভাবে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; এবং তাদের কেউই স্বতন্ত্র নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কে এগুলিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করেছেন। যিনি তা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে,—সমস্ত পরস্পর নির্ভরশীল বস্তুদের পরম উৎস হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তিনি হচ্ছেন পরম সত্য বা পরমাত্মা যিনি অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন না। তিনি স্বাশ্রয়াশ্রয়। তিনি কেবল নিজেরই উপর নির্ভর করেন, এবং তাই তিনি সবকিছুরই পরম আশ্রয়। যদিও পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভগবানের আশ্রিত, কেননা ভগবানই হচ্ছেন পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ, তাই তিনি হচ্ছেন পরমাত্মারও উৎস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং সব কিছুরই উৎস, এবং এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের, এমনকি পরমাত্মা এমনকি পরমব্রহ্মেরও চরম উৎস ও আশ্রয়। যদি স্বীকার করা হয়ও যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবু জীবাত্মাকে জড়া প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরমাত্মারই উপর নির্ভর করতে হয়। জীবাত্মা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাই যদিও সে গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তবুও সে মায়ার প্রভাবে নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে মোহগ্রস্ত হয়। এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার উপর নির্ভর করতে হয়, যার ফলে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে তার সঙ্গে গুণগতভাবে এক। সেই সূত্রেও পরমাত্মা হচ্ছেন পরম আশ্রয়, এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

জীব সর্বদাই পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, কেননা জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হয়, কিন্তু পরমাত্মার কখনো এইপ্রকার বিস্মৃতি হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে

জীবাত্মারূপ অর্জুন কিভাবে তাঁর পূর্বের বহু বহু জন্মের স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু পরমাত্মা স্বরূপ ভগবানের সব কিছুই স্মরণে রয়েছে। এমনকি কোটি কোটি বছর পূর্বে ভগবান কিভাবে সূর্যদেবকে শ্রীমদ্ভগবদগীতার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাও তাঁর মনে আছে। ভগবান এইভাবে অনন্তকোটি বছরের কথাও মনে রাখতে পারেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৭/২৬) বলা হয়েছে—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।

সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান পূর্বে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু পরমাত্মা এবং ব্রহ্মের আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও সেই ভগবানকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা জানতে পারে না।

বিশ্বচেতনা এবং জীবাত্মার চেতনা এক বলে যে প্রচার হয় তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কেননা অর্জুনের মতো ব্যক্তি বা জীবাত্মাও তাঁর পূর্ব কর্মের কথা স্মরণ রাখতে পারেননি, যদিও তিনি সর্বদাই ভগবানের সহচর। তা হলে সাধারণ মানুষ বিশ্বচেতনার সঙ্গে এক হয়ে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে জানার দাবী করে কি করে?

শ্লোক ১০

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ—পরমপুরুষ, পরমাত্মা; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **বিনির্ভিদ্য**—তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত করে; **যদা**—যখন; **অসৌ**—সেই; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **বিনির্গতঃ**—বেরিয়ে আসেন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অয়নম্**—স্থানে শয়ন করে; **অন্বিচ্ছন্**—ইচ্ছা করে; **অপঃ**—জল; **অস্রাক্ষীৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **শুচিঃ**—পরম পবিত্র; **শুচীঃ**—দিব্য।

অনুবাদ

বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই বিরাট পুরুষ (মহাবিষ্ণু), কারণ-সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং শয়ন করার ইচ্ছা করে দিব্য জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা এবং সমস্ত জীবের স্বতন্ত্র উৎস পরমেশ্বর পরমাত্মার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার পর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন সমস্ত জীবের একমাত্র বৃত্তি, ভগবদ্ভক্তির পরম প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ এবং কলাসমূহ পরস্পর থেকে অভিন্ন, এবং তাই তাঁদের সকলেরই পরম স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

তা প্রমাণ করার জন্য শুকদেব গোস্বামী (পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে) জড় সৃষ্টিতেও ভগবানের পুরুষাবতারের স্বাতন্ত্র্যের কথা বর্ণনা করছেন। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপও দিব্য, এবং তাই সেগুলিও পরমেশ্বর ভগবানের লীলা। ভক্তির ক্ষেত্রে আত্ম-উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করা অত্যন্ত অনুকূল।

কেউ তর্ক করতে পারে, মথুরা এবং বৃন্দাবনে ভগবানের যে সমস্ত লীলা, যা এই পৃথিবীর যে কোন বিষয়ের থেকে মধুরতর, সেই সমস্ত লীলার রস আস্বাদন করা হোক না কেন? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার উত্তরে বলেছেন যে, ভগবানের বৃন্দাবন লীলাসমূহ উন্নত ভক্তদের আস্বাদনীয়। নবীন ভক্তরা ভগবানের পরম দিব্য এই সমস্ত লীলা-বিলাসের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তার ভ্রান্ত অর্থ করতে পারে, এবং তাই এই জগতে সৃষ্টি পালন এবং সংহারবিষয়ক ভগবানের লীলাসমূহ প্রাকৃত ভক্তদের কাছে অধিক আস্বাদনীয়। ঠিক যেমন জড় দেহের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ব্যক্তিদের জন্য দৈহিক ব্যায়াম ভিত্তিক যোগাসনের প্রক্রিয়া রয়েছে, তেমনি জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার বিষয়ক ভগবানের লীলাসমূহ জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জন্য। এই প্রকার জড় বিষয়াসক্ত জীবদের সমস্ত বিধি-বিধানের নির্মাতা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার জন্য তাই ভগবানের আইনের মাধ্যমে দেহের ক্রিয়া এবং জগতের ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পারিভাষিক শব্দের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সেই সমস্ত অন্ধ বিজ্ঞানীরা বিধি-বিধানের সৃষ্টিকর্তার কথা ভুলে যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বিধি-বিধানের নির্মাণকর্তাকে ইঙ্গিত করে।

জটিল ইঞ্জিন অথবা ডায়নামোর যান্ত্রিক আয়োজন দেখে মানুষের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে ইঞ্জিনিয়ার এরকম অদ্ভুত যন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রশংসা করা উচিত। এইটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য। ভক্তরা সর্বদাই ভৌতিক জগতের পরিচালক ভগবানের মহিমা সর্বদা কীর্তন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) জড়া প্রকৃতির উপর ভগবানের অধ্যক্ষতার বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।।

"ভৌতিক নিয়মে পূর্ণ জড়া প্রকৃতি আমার বিভিন্ন শক্তির একটি ; তাই তা স্বতন্ত্র নয় এবং অন্ধ নয়। যেহেতু আমি সর্বশক্তিমান, জড়া প্রকৃতির প্রতি আমার দৃষ্টিপাতের প্রভাবেই জড়া প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম এরকম বিচিত্রভাবে কার্য করছে। সেই জন্যই ভৌতিক নিয়মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, এবং এইভাবেই ক্রমে ক্রমে জড় জগতের সৃষ্টি হচ্ছে পালন হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে।"

কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা জীব শরীরের রচনা এবং এই জগতের ভৌতিক নিয়মসমূহ অবলোকন করে আশ্চর্যান্বিত হয় এবং মূর্খতাবশত ভৌতিক নিয়মসমূহকে স্বতন্ত্র বলে

মনে করে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। *ভগবদ্গীতার* (৯/১১) মানুষের এই মূর্খতার উত্তরে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীতা ৯/১১)

"মূর্খ মানুষেরা (*মূঢ়াঃ*) পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবগত নয়।" মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর তাদের মতো, এবং তাই ভৌতিক নিয়মের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের অন্তহীন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার চিন্তা তারা করতে পারে না। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর আপন মায়ার প্রভাবে অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণ মানুষেরও গোচরীভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অবতরণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে অতি অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রদান করে থাকে। তথাপি মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে চায় না। সাধারণত তারা ভগবানের অতি ক্ষুদ্র এবং বিরাট রূপ বিবেচনা করে, কেননা তারা নিজেরা অণু অথবা অনন্ত হতে অক্ষম। কিন্তু মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, ভগবানের অণু এবং অনন্ত আকার ভগবানের সর্বোচ্চ মহিমা নয়। তাঁর শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শন তখনই হয়, যখন অনন্ত ভগবান আমাদের মধ্যে আমাদেরই মতো একজন হয়ে প্রকট হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকলাপ সসীম জীব দেহ থেকে ভিন্ন। সাত বছর বয়সে একটি পর্বত হাতে ধারণ করা এবং যৌবনে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করা তাঁর অনন্ত শক্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত; কিন্তু তা সত্ত্বেও মূঢ়রা তা দর্শন করে এবং শ্রবণ করেও সেগুলিকে গল্পকথা বলে অস্বীকার করে এবং ভগবানকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা বুঝতে পারে না যে তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে নররূপ ধারণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবস্থাতেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান।

কিন্তু সেই মূঢ়রা যখন পরম্পরার মাধ্যমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগত চিত্তে স্মরণ করে, তখন সেই মূঢ় ব্যক্তি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। তাই এই সমস্ত মূঢ়দের কল্যাণের জন্যই ভগবানের ভৌম-লীলাসমূহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

তাস্ববাৎসীৎ স্ব-সৃষ্টাসু সহস্রংপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥ ১১॥

তাসু—তাতে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **স্ব**—স্বীয়; **সৃষ্টাসু**—সৃষ্টিকার্যে; **সহস্রং**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—তাঁর গণনা অনুসারে বৎসর; **তেন**—সেই

কারণে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **নাম**—নামক; **যৎ**—যেহেতু; **আপঃ**—জল; **পুরুষোদ্ভবাঃ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন এবং তাই স্পষ্টভাবে তিনি নর বা পুরুষ। সেই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত সেই দিব্য জলরাশি তাই নার বলে কথিত। যেহেতু তিনি সেই জলে শয়ন করেন তাই তার নাম নারায়ণ। নিজের সৃষ্ট সেই জলে তিনি হাজার হাজার বছর বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥

দ্রব্যম্—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **কালঃ**—সময়; **চ**—ও; **স্বভাবঃ জীবঃ**—জীবাত্মাসমূহ; **এব**—নিশ্চয়ই; **চ**—ও; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহতঃ**—কৃপার প্রভাবে; **সন্তি**—বর্তমান; **ন**—করে না; **সন্তি**—বর্তমান; **যৎ-উপেক্ষয়া**—উপেক্ষার ফলে।

অনুবাদ

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং এই সবের ভোক্তা জীব কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই বর্তমান, এবং তিনি উপেক্ষা করলে আর তাদের অস্তিত্ব থাকে না।

তাৎপর্য

জীব জড় উপাদান, কাল, স্বভাব ইত্যাদির ভোক্তা, কেননা তারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। ভগবান হচ্ছেন পরম ভোক্তা, এবং জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের ভোগে সহায়তা করা এবং এইভাবে দিব্য আনন্দে অংশগ্রহণ করা। ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই ভোগে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে মোহিত হয়ে জীবেরা ভগবানের মতো ভোক্তা হতে চায়, যদিও সেই প্রচেষ্টাটি তার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ভগবদ্গীতায় জীবকে ভগবানের পরা-প্রকৃতি সম্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই জীব কখনই পুরুষ বা প্রকৃত ভোক্তা নয়। জড় জগতে জীবের ভোগ করার বাসনা ভ্রান্ত। চিজ্জগতে জীবেরা শুদ্ধ, এবং তাই তারা ভগবানের আনন্দ উপভোগে অংশ গ্রহণ করে।জড় জগতে স্বীয় কর্মের মাধ্যমে জীবের ভোগের প্রচেষ্টা প্রকৃতির নিয়মে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং এইভাবে মায়া ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ জীবের কানে পরামর্শ দেয়। সেটিই

হচ্ছে মায়ার অন্তিম ফাঁদ। ভগবানের কৃপায় যখন এই শেষ ফাঁদটিকেও অতিক্রম করা যায়, তখন জীব পুনরায় তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মায়ার এই বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করার জন্য ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, কিছু কালের জন্য (তাঁর গণনায় এক হাজার বছর পর্যন্ত, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে) পালন করেন এবং তারপর পুনরায় তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তার লয় সাধন করেন। তাই জীবেরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তাদের তথাকথিত সুখ উপভোগ ভগবানের ইচ্ছায় ধূলিসাৎ হয়।

শ্লোক ১৩

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥ ১৩ ॥

একঃ—তিনি, একলা; **নানাত্বম্**—বহুরূপে; **অন্বিচ্ছন্**—ইচ্ছা করে; **যোগতল্পাৎ**—যোগনিদ্রার শয্যা থেকে; **সমুত্থিতঃ**—উত্থিত হলেন; **বীর্যম্**—বীর্য; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণাভ; **দেবঃ**—দেবতা; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **ব্যসৃজৎ**—পূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছিলেন; **ত্রিধা**—তিনভাবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বহু রূপে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন এবং হিরণ্ময় বীর্যকে মায়াশক্তির দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৭-৮) জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

"কল্পান্তে সম্পূর্ণ সৃষ্টি, যথা জড় জগৎ এবং প্রকৃতিতে ক্লেশ প্রাপ্ত জীব আমার দিব্য দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং নতুন কল্পের আরম্ভে আমার ইচ্ছার প্রভাবে তারা পুনরায় প্রকাশিত হয়। এইভাবে এই প্রকৃতি আমার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আমার ইচ্ছার প্রভাবে তা পুনঃ পুনঃ প্রকট হয় এবং লয় হয়।"

এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে ভগবান পূর্ণশক্তি (*মহাসমষ্টি*) রূপে বিদ্যমান থাকেন, এবং নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা করে তিনি নিজেকে বহুমুখী শক্তি (*সমষ্টি*)

রূপে বিস্তার করেন। এই সমষ্টি শক্তি থেকে তিনি পুনরায় নিজেকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক শক্তিরূপে বিস্তার করেন, যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (*ব্যষ্টি*)। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি তথা সৃজনী শক্তি যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। যেহেতু সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত (*মহাবিষ্ণু বা মহাসমষ্টি*), তাই জড় সৃষ্টিতে কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয় ; কিন্তু এই সমস্ত শক্তির বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ এবং প্রকাশ রয়েছে, এবং তাই তারা যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন। জীবও ভগবানের এইপ্রকার শক্তি (*তটস্থা শক্তি*) ; এবং তাই তারা ভগবান থেকে যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন।

অব্যক্ত অবস্থায় জীবশক্তি ভগবানে লীন থাকে, এবং যখন তাদের জড় জগতে প্রকাশ করা হয়, তখন তারা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাসনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। জীবের এই বিভিন্ন প্রকাশ তার বদ্ধ অবস্থা। কিন্তু মুক্ত জীবেরা তাদের সনাতন স্বরূপে ভগবানের শরণাগত থাকে, এবং তাই তারা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এইভাবে যোগনিদ্রায় শায়িত ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ প্রকট হয় এবং বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ১৪

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥

অধিদৈবম্—নিয়ন্ত্রণকারী জীব ; **অথ**—এখন ; **অধ্যাত্মম্**—নিয়ন্ত্রিত জীব ; **অধিভূতম্**—জড় শরীর ; **ইতি**—এইভাবে ; **প্রভুঃ**—ভগবান ; **অথ**—এইভাবে ; **একম্**—কেবল এক ; **পৌরুষম্**—তাঁর প্রভুত্বের ; **বীর্যম্**—শক্তি ; **ত্রিধা**—তিনভাগে ; **অভিদ্যত**—বিভক্ত ; **তৎ**—তা ; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

ভগবানের শক্তি কিভাবে অধিদৈব, অধিআত্ম এবং অধিভূত এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তা আমার কাছে শ্রবণ কর।

শ্লোক ১৫

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্তঃশরীরে—দেহাভ্যন্তরে ; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে ; **পুরুষস্য**—মহাবিষ্ণু ; **বিচেষ্টতঃ**—চেষ্টা করে অথবা ইচ্ছা করে ; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল ; **সহঃ**—মনের বল ;

বলম্—দেহের বল ; **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছে ; **ততঃ**—তারপর ; **প্রাণঃ**—জীবনীশক্তি ; **মহানসু**—সকলের জীবনের উৎস।

অনুবাদ

মহাবিষ্ণুর দিব্য শরীরের হৃদয়াকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি উৎপন্ন হল। তারপর সমস্ত জীবনী শক্তির উৎসস্বরূপ প্রাণশক্তি উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১৬

অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুপ্রাণন্তি—জীবনের লক্ষণসমূহ অনুসরণ করে ; **যম্**—যাঁকে ; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **প্রাণন্তম্**—প্রচেষ্টা করে ; **সর্বজন্তুষু**—সমস্ত জীবে ; **অপানন্তম্**—প্রচেষ্টা করা বন্ধ করে ; **অপানন্তি**—অন্য সব কিছু বন্ধ হয় ; **নরদেবম্**—রাজা ; **ইব**—মতো ; **অনুগাঃ**—অনুচর।

অনুবাদ

রাজার অনুচরেরা যেমন তাদের প্রভুর অনুগমন করে, তেমনই জীবদেহের ব্যষ্টি প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিশ্চেষ্ট হলে সমস্ত জীবদেহের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও স্তব্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবেরা পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক বাতির যেমন স্বতন্ত্র জ্যোতি নেই, ঠিক তেমনই এই সমস্ত জীবেদের কারোরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, উৎপাদন-কেন্দ্র বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করার জন্য জলাশয়ের উপর নির্ভর করে, জলাশয়গুলি মেঘের উপর নির্ভর করে, মেঘ সূর্যের উপর নির্ভর করে, সূর্য সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, এবং সৃষ্টি ভগবানের চেষ্টা বা গতির উপর নির্ভর করে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৭

প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুৎতৃড়ন্তরা জায়তে বিভোঃ।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥ ১৭ ॥

প্রাণেন—জীবনী-শক্তির দ্বারা ; **আক্ষিপতা**—ক্ষুব্ধ হয়ে ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা ; **তৃৎ**— তৃষ্ণা ; **অন্তরা**—অভ্যন্তর থেকে ; **জায়তে**—উৎপন্ন হয় ; **বিভোঃ**—পরমেশ্বরের ;

পিপাসতঃ—তৃষ্ণা নিবারণের বাসনা ; **জক্ষতঃ**—আহার করার বাসনায় ; **চ**—এবং ; **প্রাক্**—প্রথমে ; **মুখম্**—মুখ ; **নিরভিদ্যত**—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রাণশক্তি কর্তৃক ক্ষোভিত হয়ে বিরাট পুরুষের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, এবং যখন তিনি আহার এবং পান করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মুখ বিকশিত হয়।

তাৎপর্য

যেভাবে মায়ের গর্ভে জীবের অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিকাশ হয়, সমস্ত জীবের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষেরও অনেকটা তাই হয়। তাই সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ নির্বিশেষ নন অথবা বাসনারহিত নন। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির বাসনা পরমেশ্বর ভগবানে রয়েছে এবং তাই প্রত্যেক জীবের মধ্যেও তার প্রকাশ হয়। এই বাসনা হচ্ছে পরম সত্য, পরম পুরুষের প্রকৃতি। যেহেতু সমস্ত মুখের সমষ্টি হচ্ছেন তিনি, তাই জীবেরও মুখ রয়েছে। তেমনই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর রয়েছে বলেই জীবের মধ্যে প্রকাশ হয়। এখানে মুখ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, কেননা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বেলায়ও এই একই তত্ত্ব প্রযোজ্য।

শ্লোক ১৮

মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে ॥ ১৮ ॥

মুখতঃ—মুখ থেকে ; **তালু**—তালু ; **নির্ভিন্নম্**—উৎপন্ন হয়ে ; **জিহ্বা**—জিহ্বা ; **তত্র**—তারপর ; **উপজায়তে**—প্রকট হয় ; **ততঃ**—তারপর ; **নানারসঃ**—বিভিন্ন প্রকার স্বাদ ; **জজ্ঞে**—প্রকট হয় ; **জিহ্বয়া**—জিহ্বার দ্বারা ; **যঃ**—যা ; **অধিগম্যতে**—আস্বাদিত হয়।

অনুবাদ

মুখ থেকে তালু প্রকট হয় এবং তারপর জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উৎপত্তি হয় যাতে জিহ্বা তাদের আস্বাদন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই ক্রমিক বিকাশের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের (*অধিদৈব*) তত্ত্ববিশ্লেষণ করে, কেননা বরুণ হচ্ছেন সমস্ত আস্বাদ্য রসের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা। তাই মুখ জিহ্বার আশ্রয়স্থল এবং জিহ্বা বিভিন্ন রসের আশ্রয় স্থল, যার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন বরুণদেব। তাই বোঝা যায় জিহ্বার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বরুণদেবেরও উৎপত্তি হয়েছিল। জিহ্বা এবং তালু নিমিত্ত হওয়ার ফলে *অধিভূত* বা পদার্থের রূপ, কিন্তু তার

যে নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা, যিনি হচ্ছেন একজন জীব, তিনি *অধিদৈব*, আর যার উপর কার্য করা হয় তিনি *অধ্যাত্ম*। এইভাবে বিরাট পুরুষের মুখ খোলার পর তিন শ্রেণীর জন্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শ্লোকে যে চারটি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে পূর্বে আলোচিত তিনটি মুখ্য তত্ত্ব, অর্থাৎ অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে চৈতস্য সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত ॥ ১৯ ॥

বিবক্ষোঃ—যখন কথা বলার ইচ্ছা হয়েছিল; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **ভূম্নঃ**—পরমেশ্বরের; **বহ্নিঃ**—অগ্নি বা অগ্নিদেব; **বাক্**—শব্দ; **ব্যাহৃতম্**—বাণী; **তয়োঃ**—উভয়ের দ্বারা; **জলে**—জলে; **চ**—ও; **এতস্য**—এই সকলের; **সুচিরম্**—অতি দীর্ঘকাল; **নিরোধঃ**—অবরোধ; **সমজায়ত**—হয়েছিল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কথা বলতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে বাক্ (*ইন্দ্রিয়*) ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি প্রকাশিত হলেন। পরে তিনি যখন জলে শয়ন করেছিলেন, তখন এই সমস্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ ছিল।

তাৎপর্য

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রমিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয়। তাই বুঝতে হবে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি একপ্রকার বদ্ধ জীবকে স্বাধীনভাবে আচরণ করার অনুমতি দেওয়ার মতো, যাদের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের নিয়ন্ত্রণে সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। যারা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হয়ে দণ্ডভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিহ্বা এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণের বিবেচনা করা যায়। জিহ্বা আহারের জন্য, এবং মানুষ, পশু, পক্ষী সকলেরই বিভিন্ন প্রকার আস্বাদন রয়েছে, কেননা তাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মানুষের স্বাদ আর একটি শূকরের স্বাদ এক প্রকার নয়। কিন্তু বিভিন্ন জীবাত্মা যখন প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ আস্বাদনের প্রবণতা বিকশিত করে, তখননিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা বিশেষ প্রকারের শরীর প্রদান করেন। যেমন, কোন মানুষ যদি শূকরের মতো স্বাদ গ্রহণের প্রবণতা অর্জন করে এবং কোন রকম বাছবিচার না করে সব কিছু খেতে শুরু করে, তখন নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাকে তার পরবর্তী জীবনে একটি শূকরের শরীর লাভ

করার অনুমতি দেন। শূকর সব কিছু খায়, এমনকি বিষ্ঠা পর্যন্ত, এবং কোন মানুষ যদি এই প্রকার বাছবিচারহীন স্বাদ অর্জন করে তা হলে তাকে পরবর্তী জীবনে শূকরের মতো নিকৃষ্ট জীবন লাভের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রকার জীবনও ভগবানেরই করুণার প্রকাশ, কেননা বদ্ধ জীব সেই প্রকার শরীর কামনা করে যাতে সে পূর্ণরূপে বিশেষ ধরনের খাদ্য আস্বাদন করতে পারে। কোন মানুষ যদি একটি শূকরের শরীর প্রাপ্ত হয়, তা হলে তা অবশ্যই ভগবানের করুণা বলে বিবেচনা করতে হবে, কেননা ভগবান তাকে তার বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দিচ্ছেন। মৃত্যুর পরে পরবর্তী দেহ উন্নততর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়, অন্ধভাবে নয়। মানুষকে তাই পরবর্তী জীবনের শরীর লাভের কথা চিন্তা করে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। বিচার-বিবেচনাশূন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সমস্ত শাস্ত্রে সে কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ২০ ॥

নাসিকে—নাসিকায়; **নিরভিদ্যেতাম্**—বিকশিত হয়ে; **দোধূয়তি**—দ্রুত নির্গত হয়; **নভস্বতি**—শ্বাসপ্রশ্বাস, **তত্র**—তারপর; **বায়ুঃ**—বায়ু; **গন্ধবহঃ**—গন্ধ; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **নসি**—নাসিকায়; **জিঘৃক্ষতঃ**—ঘ্রাণ গ্রহণ করার বাসনায়।

অনুবাদ

তারপর পরম পুরুষ যখন ঘ্রাণ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাসিকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন হল, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে গন্ধবহনকারী বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও প্রকাশিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন ঘ্রাণ গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন, সেই সময় নাসিকা, গন্ধ, বায়ুদেবতা, ঘ্রাণ ইত্যাদি একসাথে প্রকট হয়েছিল। উপনিষদের বেদমন্ত্রে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা কোন কার্য করার পূর্বে প্রথমে ভগবান সেগুলি ইচ্ছা করেছিলেন। জীব তখনই কেবল দর্শন করতে পারে, যখন ভগবান দর্শন করেন; জীব তখনই ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে, যখন ভগবান ঘ্রাণ গ্রহণ করেন; এবং এইভাবে জীবের প্রতিটি কর্মের পিছনে রয়েছে ভগবানের অনুভূতি। অর্থাৎ জীব কখনই স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করতে পারে না। সে কেবল কোন কিছু স্বতন্ত্রভাবে করার কথা চিন্তা করতে পারে, কিন্তু সে কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। ভগবানের কৃপায় স্বতন্ত্রভাবে ইচ্ছা করার বাসনা তার রয়েছে, কিন্তু সেই বাসনা কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে

চরিতার্থ হতে পারে। তাই একটি জনপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে—"মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে এবং ভগবান তা অনুমোদন করেন।" এই বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু এই যে জীবাত্মা অধীন তত্ত্ব এবং পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সমকক্ষ হবার দাবী করে তাদের সর্বপ্রথমে প্রমাণ করা উচিত যে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এইভাবে তাদের ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার দাবীর যথার্থতা নিরূপণ করতে হবে।

শ্লোক ২১

যদাত্মনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে হ্যক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

যদা—যখন; **আত্মনি**—নিজেকে; **নিরালোকম্**—আলোক ব্যতীত; **আত্মানম্**—তার নিজের দিব্যদেহ; **চ**—এবং অন্যান্য দৈহিক রূপ; **দিদৃক্ষতঃ**—দেখার ইচ্ছা করেছিলেন; **নির্ভিন্নে**—প্রকট হওয়ার ফলে; **হি**—জন্য; **অক্ষিণী**—চক্ষুর; **তস্য**—তাঁর; **জ্যোতিঃ**—সূর্য; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **গুণগ্রহঃ**—দেখার শক্তি।

অনুবাদ

এইভাবে সব কিছু যখন অন্ধকারে ছিল, ভগবান তখন নিজেকে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন চক্ষু, আলোকের দেবতা সূর্য, দৃষ্টিশক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ সব কিছু প্রকট হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ স্বভাবতই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং তাই সমগ্র জড় সৃষ্টিকে বলা হয় *তমস* বা অন্ধকার। রাত্রি হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবিক স্বরূপ, কেননা তখন কেউই কিছু দেখতে পায় না, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত দেখতে পায় না। ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে, প্রথমে নিজেকে দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, এবং তার ফলে সূর্যদেব প্রকট হয়েছেন, সমস্ত জীবের দর্শন শক্তি সম্ভব হয়েছে এবং দর্শনীয় বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের সৃষ্টির পর সমগ্র সৃষ্টি প্রকট হয়েছে।

শ্লোক ২২

বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥ ২২ ॥

বোধমানস্য—জানবার ইচ্ছার ফলে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **আত্মনঃ**—পরম পুরুষের; **তৎ**—তা; **জিঘৃক্ষতঃ**—যখন তিনি গ্রহণ করবার ইচ্ছা করেছিলেন;

কর্ণৌ—কর্ণ; **চ**—ও; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকট হয়েছে; **দিশঃ**—দিক অথবা বায়ু দেবতা; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণ শক্তি; **গুণগ্রহঃ**—এবং শ্রবণ করার বস্তুসমূহ।

অনুবাদ

ঋষিদের জানবার ইচ্ছা বিকশিত হবার ফলে কর্ণ, শ্রবণ শক্তি, শ্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং শ্রোতব্য বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। ঋষিগণ পরমাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়রূপ পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে জানবার প্রচেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানের অর্থ কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান অথবা ভৌতিক জ্ঞানই নয়, যা ভগবানের পরিচালনায় পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির মাঝে সক্রিয় ভৌতিক নিয়মের বিষয়ে জানতে অতি উৎসুক। তারা বেতার এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে অনেক দূরে অন্যান্য গ্রহে কি হচ্ছে তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে তাদের শ্রবণ শক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ভগবান দিয়েছেন পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণ করবার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত জড় বিষয়ের বর্ণনাকারী শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রবণ শক্তির অসদ্ব্যবহার হচ্ছে। ঋষিরা কেবল বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহী ছিলেন; অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের কোন রকম উৎসাহ ছিল না। সেটিই হচ্ছে শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞান গ্রহণের সূচনা।

শ্লোক ২৩

বস্তুনো মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্বোষ্ণশীততাম্।
জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্ নির্ভিন্না তস্যাংরোমমহীরুহাঃ।
তত্র চান্তর্বহির্বাতস্ত্বচা লব্ধগুণো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

বস্তুনঃ—সমস্ত বস্তুর; **মৃদু**—কোমলতা; **কাঠিন্য**—কঠোরতা; **লঘু**—হালকা; **গুরু**—ভারী; **উষ্ণ**—উষ্ণতা; **শীততাম্**—শীতলতা; **জিঘৃক্ষতঃ**—অনুভব করার বাসনায়; **ত্বক্**—স্পর্শ; **নির্ভিন্না**—বিতরিত হয়েছে; **তস্যাম্**—ত্বকে; **রোম**—দেহের রোম; **মহীরুহাঃ**—বৃক্ষসমূহ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ; **তত্র**—সেখানে; **চ**—ও; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাহিরে; **বাতঃত্বচা**—স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বক; **লব্ধ**—উপলব্ধ হওয়ার পর; **গুণঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **বৃতঃ**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

যখন কোমলতা, কাঠিন্য, উষ্ণতা, শীতলতা, লঘুতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি ভৌতিক গুণাবলী অনুভব করার বাসনা হয়েছিল, তখন ত্বক, রোমকূপ, দেহের রোম, এবং

তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ (বৃক্ষসমূহ) উৎপন্ন হয়েছে। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে বায়ুর আবরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে স্পর্শানুভূতি প্রকট হয়েছে।

তাৎপর্য

কোমলতা আদি বস্তুর ভৌতিক গুণাবলী ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে, এবং তাই ভৌতিক জ্ঞান স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়। হাতের দ্বারা স্পর্শ করার মাধ্যমে তাপের মাত্রা অনুভব করা যায়। এবং কোন বস্তুকে হাত দিয়ে তোলার মাধ্যমে অনুভব করা যায় তা ভারী না হাল্কা। ত্বক, রোমকূপ এবং দেহের রোম স্পর্শানুভূতির ভিত্তিতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে যে বায়ু প্রভাবিত হয় তাও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি জ্ঞানেরও উৎস, এবং তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভৌতিক অথবা দৈহিক জ্ঞান আত্মজ্ঞানের অধীন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মজ্ঞান বিস্তারিত হয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত হতে পারে, কিন্তু ভৌতিক জ্ঞান কখনও আত্মজ্ঞানে পর্যবসিত হতে পারে না।

দেহের রোম এবং পৃথিবীর শরীরে বনস্পতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। তৃতীয় স্কন্ধে যার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে বনস্পতিসমূহ ত্বকের পুষ্টির জন্য ভোজন এবং ঔষধিস্বরূপ— *ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।*

শ্লোক ২৪

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥

হস্তৌ—হস্ত; **রুরুহতুঃ**—প্রকাশিত হয়েছে; **তস্য**—তাঁর; **নানা**—বিবিধ; **কর্ম**—কর্ম; **চিকীর্ষয়া**—এইভাবে ইচ্ছা করে; **তয়োঃ**—তাদের; **তু**—কিন্তু; **বলবান্**—বল প্রদান করার জন্য; **ইন্দ্র**—স্বর্গের দেবতা; **আদানম্**—হস্তের কার্যকলাপ; **উভয়াশ্রয়ম্**—দেবতা এবং হস্ত উভয়ের উপরেই নির্ভরশীল।

অনুবাদ

তারপর পরম পুরুষ যখন বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র প্রকাশিত হন, সেই সঙ্গে হস্ত এবং দেবতা উভয়েরই উপর নির্ভরশীল কার্যও প্রকট হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র নয়। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর (*হৃষীকেশ*)। এইভাবে জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে প্রকট হয়, এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিশেষ বিশেষ দেবতাদের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কেউই তার ইন্দ্রিয়ের মালিকানা দাবী করতে পারে না। জীব ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের ভৃত্য। সৃষ্টির এই ব্যবস্থা। এইভাবে সব কিছুই চরমে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং জড়া প্রকৃতি অথবা জীব উভয়ের কেউই স্বতন্ত্র নয়। যে মায়াচ্ছন্ন জীব তার ইন্দ্রিয়ের প্রভু বলে নিজেকে দাবী করে, সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব তার ক্ষুদ্র অস্তিত্বে গর্বিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন। তার পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তা সে নিজেকে যতই মুক্ত পুরুষ বলে ঘোষণা করুক না কেন।

শ্লোক ২৫

গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥

গতিং—গতি ; **জিগীষতঃ**—ইচ্ছা করে ; **পাদৌ**—পদ ; **রুরুহাতে**—প্রকাশিত হয় ; **অভিকামিকাম্**—সার্থক ; **পদ্ভ্যাং**—পা থেকে ; **যজ্ঞঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ; **স্বয়ং**—স্বয়ং ; **হব্যং**—কর্তব্য ; **কর্মভিঃ**—স্বীয় কর্তব্যকর্ম থেকে ; **ক্রিয়তে**—করান ; **নৃভিঃ**—বিভিন্ন মানুষের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছার ফলে তাঁর পা প্রকট হয়, এবং তাঁর পা থেকে পায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মানুষেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ তাদের কর্তব্যকর্মে যুক্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই তার বিশেষ কর্তব্যকর্মে যুক্ত, এবং তা বোঝা যায় যখন মানুষ ইতস্তত চলাফেরা করে। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়—শহরের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তারা গভীর উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা সহকারে ঘুরে বেড়ায়। এই গতিবিধি কেবল শহরেই সীমিত নয়, তা শহরের বাইরেও, অথবা এক শহর থেকে অন্য শহরেও বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের মাধ্যমে মানুষের চলাফেরার মাধ্যমে দৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য মানুষ রাস্তায় গাড়িতে এবং রেলে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে এবং আকাশে বিমানের মাধ্যমে গমনাগমন করে। কিন্তু এই সমস্ত গতিবিধির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এই প্রকার আরামদায়ক জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মানবিক কার্যকলাপে

বৈজ্ঞানিকেরা ব্যস্ত, শিল্পীরা ব্যস্ত, ইঞ্জিনিয়ারেরা ব্যস্ত, কারিগরেরা ব্যস্ত। কিন্তু তারা জানে না কিভাবে তাদের কার্যকলাপ সার্থক করে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। যেহেতু তারা সেই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তাদের সমস্ত কার্যকলাপ অসংযত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, এবং তাই এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা তারা অজ্ঞাতসারে গভীর তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে অধঃপতিত হচ্ছে।

যেহেতু তারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়েছে তাই তারা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গেছে, এবং তাই তারা মেনে নিয়েছে যে প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগ। কিন্তু এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা কখনো মানুষকে তাদের ঈপ্সিত শান্তি প্রদান করতে পারে না,এবং তাই প্রকৃতির সমস্ত সম্পদের ব্যবহার করার মাধ্যমে জ্ঞানের সব রকম প্রগতি সত্ত্বেও এই জড় সভ্যতায় কেউই সুখী নয়। প্রকৃত রহস্য হচ্ছে যে প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষের কর্তব্য বিশ্ব শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৪৫-৪৬) সেই একই উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—"মানুষ কিভাবে কেবল তার বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে তা তুমি আমার কাছে শ্রবণ কর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি সর্বব্যাপ্ত এবং যাঁর নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি জীব ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুসারে ঈপ্সিত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তাঁর আরাধনা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমেই কেবল সে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে।"

মানুষের বিভিন্ন প্রকার প্রবণতা থাকলে ক্ষতি নেই, কেননা বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করার স্বাতন্ত্র্য মানুষের রয়েছে। তবে কেউই যে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র নয়, সেটি ভালভাবে অবগত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সকলেরই কর্তব্য, সেই সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে মহাজনদের নির্দেশ অনুসারে প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল নিবেদন করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে পা হচ্ছে দেহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কেননা পায়ের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমনাগমন করা যায় না। তাই, সমস্ত মানুষের পায়ের উপর ভগবানের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৬

নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ ।
উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৬ ॥

নিরভিদ্যত—নির্গত হয়েছে; **শিশ্নঃ**—উপস্থ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজানন্দ**—মৈথুনসুখ; **অমৃতার্থিনঃ**—অমৃত আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষী; **উপস্থঃ**—পুরুষ অথবা স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়; **আসীৎ**—প্রকাশিত হয়েছে; **কামানাম্**—কামার্তদের; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **তৎ**—তা; **উভয়াশ্রয়ম্**—উভয়েরই আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর মৈথুন সুখের জন্য, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য এবং স্বর্গের অমৃত আস্বাদনের জন্য ভগবান জননেন্দ্রিয় প্রকাশ করেছেন। এই জননেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন প্রজাপতি। মৈথুন সুখের বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের জন্য স্বর্গীয় সুখ হচ্ছে মৈথুন, এবং এই সুখ আস্বাদন হয় উপস্থের মাধ্যমে। স্ত্রী হচ্ছে যৌন সুখের বিষয়, এবং যৌন সুখের ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং স্ত্রী উভয়েই প্রজাপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রজাপতি ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই শ্লোক থেকে নির্বিশেষবাদীদের ভালমত জেনে রাখা উচিত যে ভগবান নির্বিশেষ নন, কেননা তাঁর উপস্থও রয়েছে, যার উপর মৈথুনের সমস্ত সুখদায়ক বিষয় আশ্রয় করে রয়েছে। মৈথুনের মাধ্যমে স্বর্গীয় অমৃত আস্বাদনের সুখ যদি না থাকত তা হলে কেউই সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার করত না। বদ্ধ জীবকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীব-সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৈথুন সুখের প্রবণতা রয়েছে, এবং এই মৈথুন সুখ উপভোগ করার মাধ্যমেও ভগবানের সেবা করা যায়। সেই সেবাটি হচ্ছে—এই প্রকার মৈথুন সুখ আস্বাদনের মাধ্যমে যে সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়, তাদের যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার শিক্ষা প্রদান করা। সমগ্র জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের সুপ্ত ভগবচ্চেতনা বিকশিত করা। মানুষ ব্যতীত অন্য প্রকার জীবনে ভগবানের সেবা করার উদ্দেশ্যে মৈথুন সুখের উপভোগ হয় না। কিন্তু মনুষ্য জন্ম লাভ করার ফলে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। মানুষ মৈথুনের এই দিব্যসুখ আস্বাদন করে শত শত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে, যদি সে তাদের ভগবদ্ভক্তিতে শিক্ষিত করতে পারে; তা না হলে সন্তান-সন্ততির উৎপাদন শূকরের প্রজননের মতো। প্রকৃতপক্ষে, সেই ব্যাপারে

শূকরেরা মানুষদের থেকেও অধিক দক্ষ,কেননা তারা এক-একবারে কয়েক গণ্ডা করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মানুষ কেবল একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে। তাই সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, উপস্থ, মৈথুন সুখ, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি, এরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং যারা ভগবানের সেবা করার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তারা প্রকৃতির নিয়মে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। মৈথুন সুখ উপভোগের অনুভূতি কুকুরেরও রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভগবচ্চেতনা নেই। মানব জীবন এবং পশু জীবনের পার্থক্য কেবল ভগবচ্চেতনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ২৭

উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

উৎসিসৃক্ষোঃ—ত্যাগ করার ইচ্ছায়; **ধাতুমলম্**—খাদ্যের অসার অংশ; **নিরভিদ্যত**—প্রকট হয়েছে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **গুদম্**—মলদ্বার; **ততঃ**—তারপর; **পায়ুঃ**—মলত্যাগের ইন্দ্রিয়; **ততঃ**—তারপর; **মিত্র**—দেবতা; **উৎসর্গ**—পরিত্যক্ত বস্তু; **উভয়**—উভয়; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে মলদ্বার স্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হল এবং তারপর পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্র প্রকাশিত হলেন। পায়ু ইন্দ্রিয় এবং ত্যক্ত বস্তু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছেন মিত্র দেবতা।

তাৎপর্য

মলত্যাগ করার ব্যাপারেও পরিত্যক্ত বস্তু যখন নিয়ন্ত্রিত, তখন জীব কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে ?

শ্লোক ২৮

আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্যা নাভিদ্বারমপানতঃ।
তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথকত্বমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

আসিসৃপ্সোঃ—সর্বত্র গমন করার ইচ্ছায়; **পুরঃ**—ভিন্ন ভিন্ন দেহে; **পুর্যাঃ**—এক দেহ থেকে; **নাভিদ্বারম্**—নাভি বা উদরের ছিদ্র; **অপানতঃ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **তত্র**—তারপর; **অপানঃ**—প্রাণ শক্তির নিরোধ; **ততঃ**—তারপর; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **পৃথকত্বম্**—পৃথকরূপে; **উভয়**—উভয়; **আশ্রয়ম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর যখন তিনি এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন নাভি, অপান বায়ু এবং মৃত্যু একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যু এবং অপান বায়ু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছে নাভি।

তাৎপর্য

প্রাণ বায়ু জীবনকে ধারণ করে, এবং অপান বায়ু জীবনীশক্তিকে রোধ করে। এই উভয়ই নাভি থেকে উৎপন্ন হয়। এই নাভি এক দেহের সঙ্গে আরেক দেহের যোগসূত্র। ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে ভিন্ন শরীর রূপে প্রকট হয়েছিলেন, এবং অন্যান্য দেহের জন্মের ব্যাপারেও এই নিয়মই পালন হয়ে থাকে। একটি শিশুর শরীর তার মায়ের শরীর থেকে উৎপন্ন হয়, এবং শিশুটি যখন তার মায়ের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তা হয়ে থাকে নাভিগ্রন্থি ছিন্ন করার মাধ্যমে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই জীবেরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং সেই সূত্রে তাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

শ্লোক ২৯

আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

আদিৎসোঃ—প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায়; **অন্ন-পানানাম্**—আহার এবং পানীয়; **আসন্**— হয়েছিল; **কুক্ষি**—উদর; **অন্ত্র**—অন্ত্র; **নাড়য়ঃ**—ধমনী; **নদ্যঃ**—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সমুদ্রসমূহ; **চ**—ও; **তয়োঃ**—তাদের; **তুষ্টিঃ**—পালন পোষণ; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টি; **তৎ**—তাদের; **আশ্রয়ে**—উৎস।

অনুবাদ

যখন তাঁর আহার এবং পান করার ইচ্ছা হয়েছিল তখন কুক্ষি, অন্ত্র, ও নাড়ীসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল; নদী এবং সমুদ্রসমূহ তুষ্টি এবং পুষ্টির উৎস।

তাৎপর্য

নদীসমূহ নাড়ী-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং সমুদ্রসমূহ অন্ত্র-ইন্দ্রিয়ের দেবতা। আহার এবং পানীয়ের দ্বারা উদর পূর্তির ফলে পুষ্টি হয় এবং আহার ও পানের ফলে দেহের শক্তির পুনঃযোজন হয় পুষ্টির মাধ্যমে। তাই শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে অন্ত্র এবং নাড়ীর সুস্থ কার্যকলাপের উপর। নদী এবং সমুদ্র তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হওয়ার ফলে নাড়ী এবং অন্ত্রকে সুস্থ রাখে।

শ্লোক ৩০

নিদিধ্যাসোরাত্মমায়াং হৃদয়ং নিরভিদ্যত ।
ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সংকল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০ ॥

নিদিধ্যাসোঃ—জানবার ইচ্ছায় ; **আত্মমায়াম্**—স্বীয় শক্তি ; **হৃদয়ম্**—মনের অধিষ্ঠান ; **নিরভিদ্যত**—প্রকাশিত হয়েছিল ; **ততঃ**—তারপর ; **মনঃ**—মন ; **চন্দ্রঃ**— মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র ; **ইতি**—এইভাবে ; **সংকল্পঃ**—সংকল্প ; **কাম**—অভিলাষ ; **এব**—যতখানি ; **চ**—ও ।

অনুবাদ

যখন তাঁর স্বীয় মায়ার কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন হৃদয় (মনের অধিষ্ঠান), মন, চন্দ্র, সংকল্প এবং অভিলাষ উৎপন্ন হয়েছিল ।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবের হৃদয় পরমেশ্বর ভগবানের অংশ পরমাত্মার আসন। তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কার্য করার শক্তি লাভ করতে পারে না। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবেরা তাদের স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে এই সৃষ্টিতে প্রকট হয়, এবং পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাদের সকলকে উপযুক্ত জড় শরীর দান করে। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই, পরমাত্মা যখন বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন বদ্ধ জীবের মন প্রকাশিত হয় এবং সে তার বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, ঠিক যেমন ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষ তার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়। তাই পরমাত্মা যখন জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন জীবের মনের বিকাশ হয় এবং তারপর মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (চন্দ্র) এবং মনের কার্যকলাপ (যথা চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা) প্রকাশিত হয়। হৃদয়ের প্রকাশ না হলে মনের কার্যকলাপ শুরু হতে পারে না, এবং হৃদয়ের প্রকাশ হয় যখন ভগবান জড় সৃষ্টির কার্যকলাপ দর্শন করতে ইচ্ছে করেন।

শ্লোক ৩১

ত্বক্চর্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ ॥ ৩১ ॥

ত্বক্—চামড়ার পাতলা আবরণ ; **চর্ম**—চামড়া ; **মাংস**—মাংস ; **রুধির**—রক্ত ; **মেদঃ**—মেদ ; **মজ্জা**—মজ্জা ; **অস্থি**—হাড় ; **ধাতবঃ**—ধাতু ; **ভূমি**—মাটি ; **অপ**—জল ; **তেজঃ**—অগ্নি ; **ময়াঃ**—প্রাধান্য ; **সপ্ত**—সাত ; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু ; **ব্যোম্**—আকাশ ; **অম্বু**—জল ; **বায়ুভিঃ**—বায়ুর দ্বারা ।

অনুবাদ

দেহের সপ্তধাতু, যথা ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি উৎপন্ন হয়েছে মাটি, জল এবং অগ্নি থেকে। আর আকাশ, জল, এবং বায়ু থেকে প্রাণবায়ু প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগৎ গঠিত হয়েছে প্রধানত মাটি, জল এবং আগুন এই তিনটি উপাদানের দ্বারা। কিন্তু প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়েছে আকাশ, বায়ু ও জল থেকে। তাই জল সমস্ত জড় সৃষ্টির স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় উপাদানেই বর্তমান। তাই জড় সৃষ্টিতে জল পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে মুখ্য উপাদান। এই জড় দেহ পঞ্চ মহাভূত কর্তৃক গঠিত, এবং স্থূল সৃষ্টি মাটি, জল, আগুন এই তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত। স্পর্শের অনুভব হয় ত্বকের সূক্ষ্ম আবরণের ফলে, আর অস্থি পাথরের মতো শক্ত। প্রাণবায়ু আকাশ, বায়ু এবং জল থেকে উৎপন্ন, এবং তাই উন্মুক্ত বায়ু, নিয়মিত স্নান এবং বাসের জন্য প্রশস্ত জায়গা সুস্থ জীবনের জন্য আবশ্যক। স্থূল শরীরের রক্ষার জন্য পৃথিবী থেকে উৎপন্ন অন্ন, শাকসব্জী, বিশুদ্ধ জল এবং উষ্ণতা লাভপ্রদ।

শ্লোক ৩২

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ।
মনঃ সর্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী ॥ ৩২ ॥

গুণাত্মকানী—গুণসমূহে লিপ্ত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ভূতাদি**—অহংকার; **প্রভবাঃ**—প্রভাবিত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **মনঃ**—মন; **সর্ব**—সমস্ত; **বিকার**—আসক্তি (সুখ এবং দুঃখ); **আত্মা**—রূপ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বিজ্ঞান**—বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত জ্ঞান; **রূপিণী**—রূপ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং গুণসমূহ অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। মন সর্ব প্রকার জড় অভিজ্ঞতার (সুখ এবং দুঃখ) দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং বুদ্ধি মনের বিবেচনা করার ক্ষমতাস্বরূপ।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব তার অহঙ্কারকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, জীব যখন জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আত্মারূপে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই অহঙ্কার জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গ করে এবং তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি জড়া

প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হয়। মন বিভিন্ন জড় অভিজ্ঞতা অনুভব করার যন্ত্র, কিন্তু বুদ্ধি হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন এবং তা সব কিছুকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যথাযথভাবে তার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসার জীবনের জটিল পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি অনুসন্ধান করতে শুরু করেন তিনি কে, তিনি কেন বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছেন এবং এই সব দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে তিনি কিভাবে নিস্তার পেতে পারেন। তার ফলে সৎসঙ্গের প্রভাবে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ আত্ম উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতর জীবনের প্রতি উন্মুখ হন। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেন মুক্তিপথগামী সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করেন। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে জড় বিষয়ের প্রতি বদ্ধ জীবাত্মার আসক্তি উপশমের উপদেশ লাভ করা যায়, এবং তার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ ধীরে ধীরে মায়া এবং অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবনে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তেব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **স্থূলম্**—স্থূল; **তে**—আপনাকে; **ব্যাহৃতম্**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মহী**—লোকসমূহ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **চ**—অন্তহীনভাবে; **আবরণৈঃ**—আবরণসমূহের দ্বারা; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **বহিঃ**—বাহ্য; **আবৃতম্**—আবৃত।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা রূপ পৃথিবী আদি অষ্ট আবরণের দ্বারা আবৃত, যা আমি পূর্বে আপনার কাছে বিশ্লেষণ করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতি মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট আবরণের দ্বারা আবৃত। এই সব আবরণ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে উদ্ভূত। এই আবরণ অনেকটা মেঘের দ্বারা সূর্যের আবৃত হওয়ার মতো। মেঘ সূর্যের সৃষ্টি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা চক্ষুকে আবৃত করে যার ফলে সূর্যকে দেখা যায় না। সূর্য কখনো মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না। মেঘ বড় জোর আকাশে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু সূর্য কোটি কোটি মাইল থেকেও বড়। তাই কয়েকশো মাইল দীর্ঘ আবরণ কখনো কোটি কোটি মাইলকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের

বিবিধ শক্তির একটি মাত্র শক্তি কখনই ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত আবরণ জড় জগতের উপর আধিপত্য করার অভিলাষী বদ্ধ জীবদের চক্ষুকে আবৃত করার জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের মোহময়ী সৃজনী শক্তি রূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভগবান তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার রাখেন। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে না, তাই তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং ভগবানের চিন্ময় রূপ অস্বীকার করে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বিরাট রূপের আবরণ স্বীকার করে, এবং তা কিভাবে হয়, তার ব্যাখ্যা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্ ।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥

অতঃ—অতএব ; **পরম্**—চিন্ময় ; **সূক্ষ্মতম্**—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত ; **নির্বিশেষণম্**—জড় রূপবিহীন ; **অনাদি**—আদিরহিত ; **মধ্য**—মধ্যবর্তী অবস্থারহিত ; **নিধনম্**—অন্ত রহিত ; **নিত্যম্**—নিত্য ; **বাক্**—বাণী ; **মনসঃ**—মনের ; **পরম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

অতএব এর (জড় জগতের) অতীত এক দিব্য জগৎ রয়েছে যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সেই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই ; তাই তা বাণী অথবা চিন্তার অতীত এবং তা জড় ধারণা থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের স্থূল বাহ্য রূপ সাময়িক বিরতির পর প্রকাশ হয়, তাই পরমেশ্বর ভগবানের এই বহিরঙ্গা রূপ তাঁর নিত্য রূপ নয়, যা আদি, মধ্য এবং অন্তহীন। যার আদি, মধ্য এবং অন্ত রয়েছে তাকে বলা হয় জড়। এই জড় জগতের শুরু হয়েছে ভগবান থেকে এবং তাই জগতের সৃষ্টির অতীত ভগবানের যে রূপ তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা সবচাইতে সূক্ষ্ম জড় ধারণারও অতীত। জড় জগতে আকাশ সূক্ষ্মতম বলে মনে করা হয়। তার থেকেও সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। কিন্তু এই আটটি বাহ্য আবরণকে পরম সত্যের বহিরাবরণ বলে বর্ণনা করা হয়, তাই পরম সত্য জড় ধারণার অনুমান এবং অভিব্যক্তির অতীত। তিনি অবশ্যই সমস্ত জড় ধারণার অতীত, তাই তাঁকে বলা হয় *নির্বিশেষণম্*। কিন্তু তা বলে এটা কখনও মনে করা উচিত নয় যে তিনি চিন্ময় গুণাবলীরহিত। *বিশেষণম্* মানে হচ্ছে গুণাবলী। তাই *নিঃ* যোগ করার ফলে তার অর্থ হচ্ছে যে তার কোন জড় গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই। এই নিষেধাত্মক পদে চারটি দিব্য গুণ রয়েছে, যথা অব্যক্ত, পরম, নিত্য এবং মন ও বাক্যের অতীত। বাক্যের অতীত

মানে জড় ধারণাশূন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না চিন্ময় স্তরে স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ তার পক্ষে ভগবানের দিব্যরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৫

অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্নন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অমুনী—এই সমস্ত; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **রূপে**—রূপসমূহে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **হি**—নিশ্চয়ই; **অনুবর্ণিতে**—ক্রমশ বর্ণিত; **উভে**—উভয়; **অপি**—ও; **ন**—না; **গৃহ্নন্তি**—গ্রহণ করে; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **সৃষ্টে**—এইভাবে সৃষ্ট হয়ে; **বিপশ্চিতঃ**—জ্ঞানী।

অনুবাদ

জড় দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের যে উপরোক্ত বর্ণনা আপনার কাছে করলাম, তা ভগবানের সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা পূর্ববর্ণিত দুটি রূপে পরমেশ্বর ভগবানকে চিন্তা করে। একদিকে তারা ভগবানের সর্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপের আরাধনা করে, আবার অ[illegible]পক্ষে তারা ভগবানের অব্যক্ত, অবর্ণনীয় সূক্ষ্মরূপের চিন্তা করে। সর্বেশ্বরবাদ এবং [illegible]কেশ্বরবাদ যথাক্রমে ভগবানের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপের ধারণায় প্রযোজ্য [illegible]গবদ্ভক্ত এই দুটি সিদ্ধান্তকেই উপেক্ষা করেন, কেননা তাঁরা যথা[illegible]ক [illegible]নেন। সেকথা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে অতি স্পষ্টভাবে [illegible]ছে, যে[illegible]নে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন প্রসঙ্গে অর্জুনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ (ভগবদ্গীতা ১১/৪৫)

ভগবানের শুদ্ধভক্ত অর্জুন পূর্বে কখনো ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, কিন্তু যখন তিনি তা দর্শন করলেন, তখন তাঁর কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করে তিনি প্রসন্ন হননি। ভগবানের সেই বিরাট রূপ দেখে তিনি ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ অথবা কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে, যা কেবল অর্জুনের প্রসন্নতা বিধান করতে পারত। নিঃসন্দেহে ভগবানের নিজেকে অনেক রূপে প্রকাশ

করার পরম শক্তি রয়েছে, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা *ত্রিপাদ-বিভূতি* নামক ভগবদ্ধামে ভগবান যে নিত্যরূপ প্রকাশ করেন তাই দর্শন করতে আগ্রহী। *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত তাঁর ধামে ভগবান চতুর্ভুজ রূপে অথবা দ্বিভুজরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড় জগতে ভগবান যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন তার অসংখ্য হাত এবং সর্বতোভাবে অন্তহীন রূপে তিনি তাঁর অসীম বিস্তার প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁকে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ অথবা কৃষ্ণরূপে আরাধনা করেন। কখনও কখনও ভগবান কৃপাপূর্বক শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহদেব আদি তাঁর বৈকুণ্ঠের রূপ সমূহ জড় জগতে প্রকাশ করেন, এবং তখন ভগবানের শুদ্ধভক্তেরা তাঁদের আরাধনা করেন। সাধারণত ভগবান জড় জগতে যে সমস্ত বাহ্য ও স্থূল রূপে প্রকাশিত হন, বৈকুণ্ঠলোকে তাদের অস্তিত্ব নেই, এবং তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাও সেই প্রকাশসমূহকে স্বীকার করেন না। প্রথম থেকেই ভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে স্থিত ভগবানের শাশ্বত রূপসমূহের আরাধনা করেন। নির্বিশেষবাদী অভক্তেরা ভগবানের জড় রূপসমূহ কল্পনা করে এবং চরমে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রাথমিক অবস্থা তথা সিদ্ধিলাভের মুক্ত অবস্থা, উভয় অবস্থাতেই চিরকাল ভগবানের আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তের আরাধনা কখনও শেষ হয় না, কিন্তু মুক্তি লাভের পর নির্বিশেষবাদী যখন ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের নির্বিশেষ রূপে লীন হয়ে যায়, তখন তার আরাধনা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের এখানে *বিপশ্চিত*, বা পূর্ণরূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ ।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্মাকর্মকঃ পরঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি ; **বাচ্য**—তাঁর রূপসমূহ এবং কার্যকলাপের দ্বারা ; **বাচকতয়া**—তাঁর চিন্ময় গুণাবলী এবং পরিকর দ্বারা ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ব্রহ্ম**—পরম ; **রূপধৃক্**—গোচরীভূত রূপ ধারণ করে ; **নাম**—নাম ; **রূপ**—রূপ ; **ক্রিয়া**—লীলাসমূহ ; **ধত্তে**—স্বীকার করেন ; **সকর্ম**—কর্মে লিপ্ত ; **অকর্মকঃ**—প্রভাবিত না হয়ে ; **পরঃ**—চিন্ময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং বৈচিত্র্যের বিষয় হয়ে নিজেকে এক অপ্রাকৃত রূপে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, তথাপি মনে হয় যেন তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত।

তাৎপর্য

যখনই জড় সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। মানুষের উচিত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে যথাযথভাবে তাঁর লীলাসমূহ জানা। তাদের কখনো মনে করা উচিত নয় যে তিনি জড় রূপ ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হন। জড়া প্রকৃতি থেকে গৃহীত যে কোন রূপ এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুর প্রতি অনুরক্ত। যে বদ্ধ জীব কোন কার্যের প্রয়োজনে জড় রূপ গ্রহণ করে, সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিও ভগবানের বিবিধ রূপ এবং কার্যকলাপ বদ্ধ জীবের মতোই প্রতীত হয়, তথাপি সেই রূপ এবং কার্যকলাপ অপ্রাকৃত এবং বদ্ধ জীবের পক্ষে তা সম্পাদন করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান কখনো এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবদ্গীতায় (৪/১৪) ভগবান বলেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

বিভিন্ন অবতারে ভগবান আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, তার দ্বারা তিনি কখনো প্রভাবিত হননা, এবং সকাম কর্মের দ্বারা সাফল্য অর্জন করার কোন বাসনাও তাঁর নেই। ভগবান ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আদি বিভিন্ন শক্তির দ্বারা পূর্ণ, এবং তাই তাঁকে বদ্ধ জীবের মতো দৈহিক পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন হয় না। যে বুদ্ধিমান মানুষ ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ এবং বদ্ধ জীবের কার্যকলাপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, তিনিও কখনো তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব রূপে ভগবান জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে সঞ্চালন করেন। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এবং ব্রহ্মা থেকে শিবের জন্ম হয়। কখনো কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ এবং কখনো কখনো ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বয়ং। এইভাবে ব্রহ্মা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি করেন, যার অর্থ হচ্ছে ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর অধিকৃত সহকারীদের মাধ্যমে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৩৭-৪০

প্রজাপতীন্মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্॥ ৩৭॥
কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্নরান্।
মাতৃ রক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্॥ ৩৮॥
কূষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
খগান্মৃগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্নৃপ সরীসৃপান্॥ ৩৯॥

দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ ।
কুশলাকুশলা মিশ্রাঃ কর্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪০ ॥

প্রজাপতীন্—ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি তাঁর পুত্রগণ ; **মনূন্**—বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ ; **দেবান্**—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ ; **ঋষীন্**—ভৃগু এবং বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ ; **পিতৃগণান্**—পিতৃলোকের অধিবাসীগণ ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে ; **সিদ্ধ**— সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ ; **চারণ**—চারণলোকের অধিবাসীগণ ; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীগণ ; **বিদ্যাধ্র**—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসীগণ ; **অসুর**—নাস্তিকগণ ; **গুহ্যকান্**—যক্ষলোকের অধিবাসীগণ ; **কিন্নর**—কিন্নরলোকের অধিবাসীগণ ; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরালোকের সুন্দর দেবদূতীগণ ; **নাগান্**—নাগলোকের নাগতুল্য অধিবাসীগণ ; **সর্পান্**—সর্পলোকের অধিবাসীগণ ; **কিম্পুরুষান্**—কিম্পুরুষ লোকের বানরাকৃতি অধিবাসীগণ ; **নরান্**—পৃথিবীর অধিবাসীগণ ; **মাতৃ**—মাতৃলোকের অধিবাসীগণ ; **রক্ষঃ**—রাক্ষসলোকের অধিবাসীগণ ; **পিশাচান্**—পিশাচলোকের অধিবাসীগণ ; **চ**—ও ; **প্রেত**—প্রেতলোকের অধিবাসীগণ ; **ভূত**—ভূত ; **বিনায়কান্**—বিনায়ক নামক প্রেতাত্মাগণ ; **কূষ্মাণ্ড**—কূষ্মাণ্ড ; **উন্মাদ**—উন্মাদ ; **বেতালান্**—বেতাল ; **যাতুধানান্**—এক প্রকার প্রেতাত্মা ; **গ্রহান্**—শুভ এবং অশুভ নক্ষত্রগণ ; **অপি**—ও ; **খগান্**—পক্ষীগণ ; **মৃগান্**—বন্যজন্তুগণ ; **পশূন্**—গৃহপালিত পশুগণ ; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসমূহ ; **গিরীন্**—পর্বতসমূহ ; **নৃপ**—হে রাজন্ ; **সরীসৃপান্**— সরীসৃপগণ ; **দ্বিবিধাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ ; **চতুর্বিধাঃ**—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জাদি চার প্রকার জীব ; **যে**—অন্যান্যরা ; **অন্যে**—অন্য সমস্ত ; **জল**—জল ; **স্থল**—স্থল ; **নভ-ওকসঃ**—পক্ষীগণ ; **কুশল**—প্রসন্নতা ; **অকুশলাঃ**—দুঃখী ; **মিশ্রাঃ**—সুখ এবং দুঃখ মিশ্রিত ; **কর্মণাম্**—পূর্বকৃত স্বীয় কর্ম অনুসারে ; **গতয়ঃ**—ফলস্বরূপ ; **তু**—কিন্তু ; **ইমাঃ**—তারা সকলে।

অনুবাদ

হে রাজন্ ! জেনে রাখুন যে, সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কূষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পর্বত, স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, আদি চতুর্বিধ প্রাণী, জলচর, ভূচর ও খেচরসমূহ সুখী, অসুখী অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্র অবস্থায় সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে।

তাৎপর্য

এই তালিকায় যে সমস্ত বিভিন্ন জীবের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক থেকে সর্বনিম্নলোক পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে সমস্ত জীবই সর্বশক্তিমান পিতা বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট। তাই কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/৪) ভগবান তাই সমস্ত জীবদের তাঁর সন্তান-সন্ততি বলে ঘোষণা করে বলেছেনঃ

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

জড়া প্রকৃতিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদিও দেখা যায়, প্রতিটি জীব মায়ের শরীর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে, তথাপি মা সেই জন্মের পরম কারণ নন। পিতা হচ্ছেন জন্মের পরম কারণ। পিতার বীজ ব্যতীত কোন মাতাই সন্তানের জন্ম দান করতে পারেন না। তাই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন স্থিতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের বীজ থেকে, এবং অল্পজ্ঞ মানুষেরাই কেবল মনে করে যে তাদের জন্ম হয়েছে জড়া প্রকৃতি থেকে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়া প্রকৃতির অধীন হওয়ার ফলে ব্রহ্মা থেকে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শরীরে প্রকট হয়েছে।

জড়া-প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের একটি শক্তি (ভগবদ্গীতা ৭/৪)। জীবাত্মার তুলনায় জড়া প্রকৃতি নিকৃষ্ট, কেননা জীবাত্মা ভগবানের পরা প্রকৃতি সম্ভূত। ভগবানের পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতির সমন্বয়ে সমগ্র জাগতিক বিষয়সমূহ প্রকট হয়।

কিছু জীব তুলনামূলকভাবে সুখী জীবনে অবস্থিত এবং অন্যেরা দুঃখময় জীবনে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবনে কেউই সুখী নয়। কারাগারে কেউই সুখী হতে পারে না, যদিও কেউ প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হতে পারে এবং অন্য কেউ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হতে পারে। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী জীবন থেকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী জীবনে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা না করে সর্বতোভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। কেউ প্রথম শ্রেণীর কয়েদীতে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরও আবার তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীতে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। সেটিই হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রকৃত গন্তব্যস্থল।

শ্লোক ৪১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুরনৃনারকাঃ।
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে॥ ৪১॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই প্রকার; **তিস্রঃ**—তিন; **সুর**—দেবতা; **নৃ**—মানুষ; **নারকাঃ**—নারকীয় অবস্থায় যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে; **তত্র অপি**—এখানেও; **একৈকশঃ**—আরেকটি; **রাজন্**—হে রাজন; **ভিদ্যন্তে**—বিভক্ত; **গতয়ঃ**—গতিবিধি; **ত্রিধা**—তিন; **যদা**—সেই সময়; **একৈকতরাঃ**—একে অপরের সম্পর্ক; **অন্যাভ্যাম্**—অন্য থেকে; **স্বভাবঃ**—অভ্যাস; **উপহন্যতে**—উদ্ভূত হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজো এবং তমো, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অনুসারে দেব, নর এবং নারকী, এই তিন প্রকার জীব রয়েছে। হে রাজন্! এমনকি একটি গুণ প্রকৃতির অপর দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুনরায় তিনটি গুণে বিভক্ত হয়, এইভাবে প্রতিটি জীব অন্য গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অভ্যাস অর্জন করে।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব পৃথক পৃথকভাবে প্রকৃতির কোন বিশেষ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, আবার সেই সঙ্গে তার ওপর অন্য দুটি গুণের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। সাধারণত জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত জীবেরা রজো গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কেননা তারা সকলেই তাদের ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রজো গুণের প্রভাব সত্ত্বেও সঙ্গ প্রভাবে অন্য দুটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাও সব সময় থাকে। কেউ যদি সৎসঙ্গ করে তা হলে তার মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর কেউ যদি অসৎ সঙ্গ করে, তা হলে তার মধ্যে তমোগুণের বিকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে। কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। সৎ অথবা অসৎ সঙ্গের প্রভাবে মানুষ তার অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারে, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করা। সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সেবা করা, এবং সেই সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হওয়া যায়, যা আমরা ইতিপূর্বে শ্রীল নারদমুনির জীবনে দর্শন করেছি। কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার ফলে তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। জন্ম অনুসারে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, এবং তাঁর পিতা যে কে তা তাঁর জানা ছিল না; এমনকি তাঁর কোন রকম বিদ্যা শিক্ষাও ছিল না। কিন্তু কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। এই প্রকার সঙ্গ করার ফলে তাঁর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার বাসনা প্রকট হয়েছিল। আর ভগবানের মহিমা যেহেতু ভগবান থেকে অভিন্ন, ভগবানের সেই শব্দরূপী প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করেছিলেন।

তেমনই (ষষ্ঠ স্কন্ধে) অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান, এবং ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বারবনিতার অসৎ সঙ্গ প্রভাবে তিনি চণ্ডালের মতো বা সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তির দ্বার খোলার জন্য সর্বদা মহাত্মাদের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাদের সঙ্গ করার অর্থ হচ্ছে নরকের ঘোর অন্ধকারপূর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করা। মহাত্মাদের সঙ্গ করার মাধ্যমে সকলেরই উন্নত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জীবনকে সার্থক করার এটিই হচ্ছে পরম উপায়।

শ্লোক ৪২

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্নরসুরাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি ; **এব**—নিশ্চয়ই ; **ইদম্**—এই ; **জগদ্ধাতা**—সমগ্র জগতের পালনকর্তা ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ধর্ম-রূপধৃক্**—ধর্মের রূপ ধারণ করে ; **পুষ্ণাতি**—পালন করেন ; **স্থাপয়ন্**—স্থাপন করার পর ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **তির্য্যক্**— মনুষ্যেতর জীব ; **নর**—মানুষ ; **সুরাদিভিঃ**—দেবতা আদি অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রী পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পালনকর্তা রূপে, সৃষ্টির পর বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্য, মনুষ্যেতর জীবসমূহ এবং দেবতাদের মধ্যে সব রকম বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিভিন্ন জীব সমাজে অবতীর্ণ হন মায়ার বন্ধন থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ কেবল মানব সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মৎস্য, বরাহ, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপেও অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনুষ্য সমাজে তাঁর নররূপে অবতরণকালে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান বলেছেনঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছি যে ভগবান জড় সৃষ্টির থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁর চিন্ময় স্থিতি সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। তাঁর নিত্য রূপ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তাঁর সর্বশক্তিমান

ইচ্ছাকে পূরণ করেন। তাঁকে কখনও তাঁর কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। তিনি কার্য-কারণের বিচারের অতীত। জড় জগতে তাঁর প্রকাশও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন, কেননা তিনি এই জড় জগতের সমস্ত ভাল মন্দ বিচারের উর্দ্ধে। জড় জগতে মাছ অথবা শূকরকে মানুষের থেকে নিম্নস্তরের জীব বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবান যখন মৎস্যরূপে অথবা বরাহরূপে আবির্ভূত হন, তখন তাদের সম্বন্ধে জড় জগতের ধারণার কোনটিই তিনি নন। তিনি যে প্রত্যেক সমাজ ও যোনিতে প্রকট হন, তা তাঁর অহৈতুকী কৃপা, কিন্তু তা বলে তাঁকে কখনও নিম্ন যোনিসম্ভূত বলে মনে করা উচিত নয়। জড় জগতে যে ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ইত্যাদির বিচার রয়েছে তা জড়জাগতিক, এবং পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ধারণার অতীত। *পরংভাবম্* বা দিব্য প্রকৃতি, শব্দটির তুলনা কখনো জড়জাগতিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সর্বদাই একই রকম থাকে ও নিম্নস্তরের পশুর রূপ ধারণ করলেও তাঁর শক্তি কমে যায় না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং মীন, শূকররূপী তাঁর বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি সর্বব্যাপ্ত, আবার যুগপৎভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। কিন্তু অল্পজ্ঞ মূর্খ মানুষেরা, ভগবানের *পরং ভাবম্* সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে মানুষরূপ অথবা মীন রূপ ধারণ করতে পারেন। প্রতিটি মানুষই তার নিজের জ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে প্রত্যেক বস্তুর তুলনা করে, যেমন একটি কূপমণ্ডুক মনে করে যে সমুদ্র হচ্ছে তার কূপের মতো। কূপমণ্ডুক সমুদ্রের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না, এবং তাকে যখন সমুদ্রের বিশালতার কথা বলা হয়, তখন সে মনে করে যে সমুদ্র হয় তো তার কূপটি থেকে আরেকটু বড়। এইভাবে যারা ভগবানের দিব্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের পক্ষে ভগবান বিষ্ণু যে কিভাবে সমস্ত জীব সমাজে নিজেকে সমভাবে প্রকাশ করতে পারেন তা বোঝা কষ্টকর।

শ্লোক ৪৩

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিয়চ্ছতি তৎকালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—তারপর,শেষে; **কাল**—সংহার; **অগ্নি**—আগুন; **রুদ্রাত্মা**—রুদ্ররূপে; **যৎ**—যা কিছু; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই সমস্ত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সম্**—সম্পূর্ণরূপে; **নিয়চ্ছতি**—সংহার করেন; **তৎকালে**—যুগান্তে; **ঘনানীকম্**—পুঞ্জীভূত মেঘ; **ইব**—সদৃশ; **অনিলঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর কল্পান্তে ভগবান রুদ্ররূপে সমগ্র সৃষ্টিকে সংহার করবেন, ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

মেঘের সঙ্গে সৃষ্টির এই তুলনা খুবই উপযুক্ত। মেঘের সৃষ্টি হয় আকাশে অথবা আকাশেই তাদের স্থিতি, এবং যখন তারা স্থানান্তরিত হয় তখন তারা আকাশেই অব্যক্ত রূপে থাকে। তেমনই, ব্রহ্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি তা পালন করেন এবং রুদ্র বা শিব রূপে তার সংহার করেন। এ সবই সংঘটিত হয় যথাসময়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৯-২০) এই সৃজন, পালন এবং সংহার সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ।।
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।।

এই জড় জগতের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে প্রথমে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সৃষ্টি হয়, তারপর খুব সুন্দরভাবে তার বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে তার অস্তিত্ব থাকে (কখনো কখনো তা সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞেরও গণনার অতীত), কিন্তু তারপর আবার ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তার বিনাশ হয়। কারোরই তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না, এবং ব্রহ্মার রাত্রি শেষ হলে পুনরায় তার সৃষ্টি হয় পালন এবং ধ্বংসের চক্র অনুসরণ করার জন্য। যে মূর্খ বদ্ধ জীব এই অনিত্য জগতকে তার নিত্য অবস্থানের স্থান বলে গ্রহণ করেছে, তাকে বুদ্ধিমত্তা সহকারে জানতে হবে যে, এই প্রকার সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয় কেন। জড় জগতের সকাম কর্মীরা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জড় পদার্থের দ্বারা বিশাল উদ্যোগ, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় সাম্রাজ্য, বড় বড় কলকারখানা এবং বড় বড় কত কিছু করতে উৎসাহী। এই সমস্ত সম্ভাবনা এবং তার মূল্যবান শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবেরা কত কিছু তৈরি করে তাদের বাসনা চরিতার্থ করে, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সমস্ত সৃষ্টি থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় আরেকটি জীবনে বার বার সৃষ্টি করার জন্য প্রবেশ করতে হয়। যে সমস্ত মূর্খ বদ্ধ জীব এই জড় জগতে তাদের শক্তির অপচয় করে, তাদের আশা দান করার জন্য ভগবান তাদের জানান যে, আরেকটি প্রকৃতি রয়েছে যা সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজমান, এবং বদ্ধ জীবাত্মা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার মূল্যবান শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহার করে তার কি করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যথাসময়ে ধ্বংস হতে বাধ্য এই জড় জগতে জড় বিষয়ে লিপ্ত হয়ে তার সময়ের অপচয় করার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় তার শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত, যাতে সে সনাতন ধামে স্থানান্তরিত হতে পারে, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, পক্ষান্তরে রয়েছে কেবল নিত্য জীবন। সেই জগৎ পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই অনিত্য সৃষ্টি এইভাবে প্রকাশ হয় এবং ধ্বংস হয় কেবল সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের শিক্ষাপ্রদান করার জন্য, যারা অস্থায়ী বিষয়ের প্রতি

আসক্ত। তাদের আত্ম-উপলব্ধির একটি সুযোগ দান করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য, সকাম কর্মীদের পরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়-সুখ প্রদান করা নয়।

শ্লোক ৪৪

ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থংভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থম্—এইরূপে; **ভাবেন**—সৃষ্টি এবং ধ্বংসের বিষয়ে; **কথিতঃ**—বর্ণনা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবত্তমঃ**—মহান তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা; **ন**—না; **ইত্থম্**—এতে; **ভাবেন**—রূপ; **হি**—কেবল; **পরম্**—সবচাইতে মহিমান্বিত; **দ্রষ্টুম্**—দেখার জন্য; **অর্হন্তি**—যোগ্য; **সূরয়ঃ**—পরম ভক্ত।

অনুবাদ

মহান্ তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত রূপের অতীত ভগবানের অধিক মহিমামণ্ডিত দিব্য কার্যকলাপ দর্শন করার উপযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে এই জড় জগতের কেবল স্রষ্টা এবং সংহারকই নন, তিনি একজন সাধারণ স্রষ্টা এবং সংহারকের থেকেও অধিক আরো কিছু, কেননা তাঁর আনন্দময় রূপ রয়েছে। ভগবানের এই আনন্দময় রূপ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য আর কেউ পারে না। নির্বিশেষবাদীরা কেবল ভগবানের সর্বব্যাপী প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করেই সন্তুষ্ট। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম-উপলব্ধি। নির্বিশেষবাদীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যোগী, যারা হৃদয়ে পরমাত্মারূপ ভগবানের অংশ প্রকাশ দর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রেমময়ী সেবার দ্বারা বাস্তবিকভাবে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিতে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

বৈকুণ্ঠলোক নামক ভগবানের নিত্যধামে সর্বদা ভগবান তাঁর পার্ষদসহ বিরাজ করেন এবং বিভিন্ন চিন্ময় রসে সেবারত শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা আস্বাদন করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা এই জড় সৃষ্টির প্রকটকালে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ করার মাধ্যমে যথাযথভাবে ভগবানকে জানা যায় এবং তার ফলে তাঁর সেবা করার শিক্ষা লাভ করে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ভগবানের সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ সঙ্গ লাভ করা যায় গোলোক বৃন্দাবনে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের সঙ্গে এবং তাঁর প্রিয় সুরভী গাভীদের সঙ্গে পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা ব্রহ্ম-সংহিতাতে রয়েছে, সেটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবিষয়ে সবচাইতে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে বিবেচনা করেছেন।

শ্লোক ৪৫

নাস্য কর্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে ।
কর্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥

ন—কখনই নয়; **অস্য**—এই সৃষ্টির; **কর্মণি**—বিষয়ে; **জন্মাদৌ**—সৃষ্টি এবং সংহার; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **অনুবিধীয়তে**—এইভাবে বর্ণিত হয়েছে; **কর্তৃত্ব**— কর্তৃত্ব; **প্রতিষেধার্থং**—প্রতিরোধ করার জন্য; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **আরোপিতম্**—প্রকাশিত; **হি**—জন্য; **তৎ**—স্রষ্টা।

অনুবাদ

এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার কার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত হন না। বেদে তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের যে বর্ণনা রয়েছে, তা কেবল জড়া প্রকৃতি যে স্রষ্টা নয়, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের বিষয়ে বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,* অর্থাৎ সব কিছু ব্রহ্মর দ্বারা সৃষ্ট হয়, সৃষ্টির পর সব কিছু ব্রহ্মর দ্বারা পালিত হয় এবং সংহারের পর সব কিছু ব্রহ্মে সংরক্ষিত হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ জড়বাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে জড়া প্রকৃতি হচ্ছে জড় জগতের পরম কারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও এই মত। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। বেদান্ত-দর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্ম হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের মূল উৎস, এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেস্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্* ইত্যাদি।

জড় পদার্থে নিঃসন্দেহে কার্য করার শক্তি নিহিত রয়েছে, কিন্তু তাতে নিজে কার্য করার উপযোগী উদ্যম নেই। শ্রীমদ্ভাগবত তাই *জন্মাদ্যস্য* সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন, *অভিজ্ঞ* এবং *স্বরাট্*, অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম জড় নয়, তিনি হচ্ছেন পরম চেতন এবং সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। তাই জড় পদার্থ কখনই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের পরম কারণ হতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে মনে হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হয়। সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের তিনিই হচ্ছেন পরম আশ্রয় এবং তা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

জড়া প্রকৃতি ভগবানের একটি শক্তি, এবং তিনি ভগবানের পরিচালনায় কার্য করেন (*অধ্যক্ষেণ*)। ভগবান যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি তাঁর দিব্য দৃষ্টিপাত করেন, তখনই কেবল জড়া প্রকৃতি সক্রিয় হতে পারেন, ঠিক যেমন পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গ করার ফলেই মাতা গর্ভধারণ করতে সক্ষম হন। যদিও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মনে হতে পারে যে মাতা সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পিতাই হচ্ছে সন্তানের জন্মদাতা। তাই জড়া প্রকৃতি পরম পিতার সংসর্গে আসার পরেই কেবল জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ উৎপাদন করেন ; স্বতন্ত্রভাবে তার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদির কারণ বলে মনে করাকে বলা হয় *অজাগলস্তন-ন্যায়*। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে* *'অজাগলস্তন-ন্যায়ের'* ব্যাখ্যা করে বলেছেন (সেই ব্যাখ্যা করেছেন প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও)—"জড়া প্রকৃতি উপাদান কারণরূপে *প্রধান* নামে পরিচিত, এবং নিমিত্ত কারণরূপে *মায়া* নামে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু তা জড় পদার্থ তা কখনো জগতের মূল কারণ হতে পারে না।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥

(*চৈঃ চঃ আদি ৫/৬১*)

যেহেতু কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই তিনি জড়া প্রকৃতিকে সক্রিয় করেন। এই সূত্রে বৈদ্যুতিকরণের দৃষ্টান্তটি যথাযথ। লোহা অবশ্যই আগুন নয়, কিন্তু যখন লোহাকে গরম করে লোহিত-তপ্ত করা হয়, তখন অবশ্যই তার মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে। জড় পদার্থকে একখণ্ড লোহার সঙ্গে তুলনা করা হয়, এবং তা বিদ্যুৎময় অথবা উত্তপ্ত হয় শ্রীবিষ্ণুর পরম চেতনা বা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। এই প্রকার শক্তি সঞ্চারের ফলেই কেবল জড়া শক্তি বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। তাই জড় বস্তু কখনো নিমিত্ত অথবা উপাদান কারণ হতে পারে না। শ্রী কপিলদেব বলেছেন—

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

[*শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৮/৪০*]

মূল অগ্নি, তার শিখা, স্ফুলিঙ্গ এবং ধূম এক। কিন্তু অগ্নি অগ্নি হওয়া সত্ত্বেও শিখা থেকে ভিন্ন, শিখা স্ফুলিঙ্গ থেকে ভিন্ন এবং স্ফুলিঙ্গ ধূম থেকে ভিন্ন। তাদের সকলের মধ্যে, অর্থাৎ শিখায়, স্ফুলিঙ্গে এবং ধূমে আগুনের সত্তা বর্তমান, তথাপি তারা ভিন্ন। জড় জগতকে ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; ধূম যখন আকাশের উপর দিয়ে যায়, তখন তাতে আমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত নানারকম রূপের আকৃতি দেখা যায়। জীবের সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের তুলনা করা হয়েছে এবং অগ্নি শিখাকে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে (প্রধান) তুলনা করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, তাদের প্রকৃতি সক্রিয় হয় অগ্নির গুণের দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার ফলে। তাই তাদের সব কটি, যথা, জড়া প্রকৃতি, জগৎ এবং জীব ভগবানের (অগ্নির) বিভিন্ন শক্তি। তাই যারা জড়া প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ (সাংখ্য দর্শন অনুসারে জড় জগতের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি) বলে বিবেচনা করে, তাদের সেই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত। ভগবান থেকে পৃথক জড়া প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে স্বীকার না করা *'অজাগলস্তন-ন্যায়ের'* মতো বা ছাগলের গলার স্তন থেকে দুধ দোহন করার চেষ্টা করার মতো। ছাগলের গলার স্তন দুধের উৎস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার থেকে দুধ দোহন করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র।

শ্লোক ৪৬

অয়ংতু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ।
বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অয়ম্—সৃষ্টি এবং সংহারের এই প্রক্রিয়া; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **কল্পঃ**—তাঁর একদিন; **সবিকল্পঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের অবধি সমেত; **উদাহৃতঃ**—উদাহরণরূপে; **বিধিঃ**—বিধি-বিধান; **সাধারণঃ**—সংক্ষেপে; **যত্র**—যেখানে; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি; **প্রাকৃত**—জড়া প্রকৃতির বিষয়ে; **বৈকৃতাঃ**—বিনিয়োগ।

অনুবাদ

এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টি এবং সংহারের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একদিনের বিধির বিধান। এটি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিরও বিধি, যাতে প্রকৃতি নিহিত থাকে।

তাৎপর্য

সৃষ্টি তিন প্রকার—মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্প। মহাকল্পে ভগবান কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে মহত্তত্ত্ব এবং সৃষ্টির ষোলটি তত্ত্ব সহ প্রথম পুরুষাবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সৃষ্টির যন্ত্র এগারটি, উপাদান পাঁচটি এবং সেগুলি সবই মহৎ বা অহঙ্কার থেকে জাত। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবানের এই সৃষ্টিকে বলা হয় মহাকল্প। ব্রহ্মার সৃষ্টি

এবং জড় উপাদানগুলি বিতরণকে বলা হয় বিকল্প, এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁর জীবনের প্রতিদিনের সৃষ্টিকে বলা হয় কল্প। তাই ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় কল্প, এবং এইভাবে ব্রহ্মার দিন অনুসারে ত্রিশটি কল্প রয়েছে। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥

উচ্চতর স্বর্গলোকে একদিন এবং রাত্রি পৃথিবীর এক বছরের সমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও সেকথা স্বীকার করেন এবং মহাকাশচারীরাও তা অনুমোদন করেন। তেমনি আরও উচ্চতর লোকে দিন-রাত্রির অবধি দীর্ঘতর। চার যুগের গণনা স্বর্গের গণনা অনুসারে বারো হাজার বছর। একে বলা হয় দিব্য যুগ, এবং এক হাজার দিব্য যুগ ব্রহ্মার এক দিনের সমান। ব্রহ্মার এক দিনের সৃষ্টিকে বলা হয় কল্প, এবং ব্রহ্মার আয়ুষ্কালকে বলা হয় বিকল্প। যে মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের ফলে একেকটি বিকল্প সম্ভব হয়, তাকে বলা হয় মহাকল্প। এইভাবে মহাকল্প, বিকল্প এবং কল্পের এক নিয়মিত এবং ধারাবাহিক চক্র রয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী স্কন্দ পুরাণের প্রভাস-খণ্ডে তা বর্ণনা করেছেন—

প্রথমঃ শ্বেতকল্পশ্চ দ্বিতীয় নীল-লোহিতঃ।
বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো গাথান্তরোঽপরঃ॥
রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতিস্মৃতঃ।
সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে॥
সদ্যোথ নবমঃ কল্প ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ।
ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ॥
ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দশঃ।
কৌর্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ॥
ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততোঽপরঃ।
আগ্নেয়ো বিষ্ণুভ্যঃ সৌরঃ সোমকল্পস্ততোঽপরঃ॥
দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ।
বৈকুণ্ঠশ্চার্ষিযস্তদ্বদ্ বলীকল্পস্ততোঽপরঃ॥
সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ।
মহেশ্বরস্তথাপ্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্রঃ ঘাতিতঃ।
পিতৃকল্পস্তথা চান্তে যঃ কুহূরব্রহ্মণঃ স্মৃতা॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার ত্রিশটি কল্প হচ্ছে—(১) শ্বেতকল্প, (২) নীললোহিত, (৩) বামদেব, (৪) গাথান্তর, (৫) রৌরব, (৬) প্রাণ, (৭) বৃহৎকল্প, (৮) কন্দর্প, (৯) সদ্যোথ (১০) ঈশান, (১১) ধ্যান, (১২) সারস্বত, (১৩) উদান, (১৪) গরুড়, (১৫) কৌর্ম, (১৬) নারসিংহ,

(১৭) সমাধি, (১৮) আগ্নেয়, (১৯) বিষ্ণুজ, (২০) সৌর, (২১) সোমকল্প,(২২) ভাবন, (২৩) সুপুম, (২৪) বৈকুণ্ঠ, (২৫) অর্চিষ, (২৬) বলীকল্প, (২৭) বৈরাজ, (২৮) গৌরীকল্প, (২৯) মাহেশ্বর, (৩০) পৈতৃকল্প।

এগুলি কেবল ব্রহ্মার দিন, এবং সেই অনুসারে মাস এবং বছরের গণনায় তাঁর আয়ু একশ বছর। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি একটি মাত্র কল্পেই কেবল কত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর পুনরায় বিকল্প, যার উৎপত্তি মহাবিষ্ণুর শ্বাস থেকে হয়। যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সমান, সুতরাং মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে মহাকল্প, এবং এই সবই সম্ভব হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য, কেননা তিনি ছাড়া অন্য আর কেউই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু নন।

শ্লোক ৪৭

পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্।
যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥ ৪৭ ॥

পরিমাণম্—মাপ ; **চ**—ও ; **কালস্য**—সময়ের ; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন ; **লক্ষণ**—লক্ষণ ; **বিগ্রহম্**—রূপ ; **যথা**—যে প্রকার ; **পুরস্তাৎ**—এরপর ; **ব্যাখ্যাস্যে**—বিশ্লেষণ করা হবে ; **পাদ্মম্**—পাদ্মনামক ; **কল্পম্**—একদিনের অবধি ; **অথঃ**—এইভাবে ; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যথাসময়ে আমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সময়ের মাপ এবং তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা করব। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পাদ্মকল্পের বিষয়ে বলবো, শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার বর্তমান কল্পের নাম বরাহ-কল্প বা শ্বেতবরাহ-কল্প, কেননা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মার সৃষ্টির সময়ে বরাহরূপে ভগবান অবতরণ করেছিলেন। তাই এই বরাহ-কল্পকে পাদ্মকল্পও বলা হয়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করে জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরাও সেই তথ্য অনুমোদন করেছেন। অতএব ব্রহ্মার বরাহ-কল্প এবং পাদ্মকল্পের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

শ্লোক ৪৮

শৌনক উবাচ

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ ।
চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুদুস্ত্যজান্ ॥ ৪৮ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক ঋষি বললেন; **যৎ**—যেমন; **আহ**— বলেছেন; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **সূত**—হে সূত; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **ভাগবতোত্তমঃ**—ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম; **চচার**—আচরণ করেছিলেন; **তীর্থানি**—তীর্থ সমূহ; **ভুবঃ**—পৃথিবী; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বন্ধূন্**—আত্মীয়-স্বজন; **সুদুস্ত্যজান্**—ত্যাগ করা কঠিন।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি সৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু শ্রবণ করার পর সূত গোস্বামীর কাছে বিদুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, কেননা সূত গোস্বামী তাঁকে পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, কিভাবে বিদুর তাঁর অতি অপরিহার্য আত্মীয়-স্বজনদের বর্জন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শৌনক আদি ঋষিগণ বিদুর সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, যে বিদুর তীর্থ পর্যটন করার সময় মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯-৫০

ক্ষত্তুঃ কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ ।
যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বন্ধুত্যাগনিমিত্তংচ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

ক্ষত্তুঃ—বিদুরের; **কৌশারবেঃ**—মৈত্রেয়ের মতো; **তস্য**—তাদের; **সংবাদঃ**—সংবাদ; **অধ্যাত্ম**—দিব্যজ্ঞান বিষয়ক; **সংশ্রিতঃ**—পূর্ণ; **যৎ**—যা; **বা**—অন্য কিছু; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **পৃষ্টঃ**—প্রশ্ন করেছিলেন; **তত্ত্বম্**—সত্য; **উবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **হ**—অতীতে; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **তৎ**—সেই সমস্ত বিষয়; **ইদম্**—এখানে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **বিদুরস্য**—বিদুরের; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **বন্ধুত্যাগ**—বন্ধুকে পরিত্যাগ করে; **নিমিত্তম্**—কারণ; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **এব**—ও; **আগতবান্**—এসেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায় (গৃহে)।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেন—দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছিল। বিদুর কি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে মৈত্রেয় কি বলেছিলেন। দয়া করে আপনি আমাদের এও বলুন বিদুর কেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এবং কেন তিনি পুনরায় গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তীর্থ পর্যটন করার সময় বিদুর কি করেছিলেন তাও আপনি আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহারের বিষয়ে বর্ণনা করছিলেন, কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে যেন শৌনক আদি ঋষিরা অধ্যাত্ম বিষয়ে শ্রবণ করার জন্য অধিক আগ্রহী ছিলেন। মানুষ দুই প্রকার, যথা—স্থূলদেহ এবং জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত মানুষ, আর অন্য শ্রেণীর মানুষেরা উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভের বিষয়ে অধিক উন্মুখ। শ্রীমদ্ভাগবত জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী উভয়েরই মঙ্গল সাধন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত জড় জগতে এবং চিজ্জগতে সম্পাদিত ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ সমানভাবে লাভবান হতে পারে। জড়বাদীরা ভৌতিক নিয়ম এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। ভৌতিক জগতের চাকচিক্য দর্শন করে তারা বিস্ময়ান্বিত হয়। কখনো কখনো জড় জগতের চাকচিক্য দর্শন করে তারা ভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়। তাদের স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে সমস্ত ভৌতিক কার্যকলাপ এবং আশ্চর্যসমূহ ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে।

বাগানের একটি গোলাপ বিকশিত হয়ে তার গঠন এবং রঙের যে সৌন্দর্য প্রকাশ করে এবং মধুর সৌরভ বিতরণ করে, তা কোন অন্ধ জড় নিয়মের ফলে নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সে রকমই মনে হয়। সেই জড় নিয়মের পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এবং পূর্ণ চেতনা, তা না হলে এত সুসংবদ্ধভাবে কোন কিছু সম্পন্ন হতে পারে না।

শিল্পী অত্যন্ত মনোযোগ এবং কলানৈপুণ্য সহকারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি গোলাপের ছবি আঁকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রকৃত গোলাপের মতো সুন্দর হতে পারে না। এটি যদি সত্য হয়, তা হলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে কোন বুদ্ধিমান পুরুষের পরিচালনা ব্যতীত গোলাপটি এত সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়েছে? অজ্ঞতার ফলেই মানুষ এই ধরনের সিদ্ধান্ত করে।

পূর্বোক্ত সৃষ্টি এবং সংহারের বর্ণনা থেকে সকলেরই জেনে রাখা অবশ্য কর্তব্য যে পরম চেতনা সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে পূর্ণরূপে সকলেরই তত্ত্বাবধান করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপকতার এইটিই হচ্ছে প্রমাণ। স্থূল জড়বাদীদের থেকেও

অধিক মূর্খ মানুষেরা নিজেদের পরমার্থবাদী বলে ঘোষণা করে দাবি করে যে, তারা সর্বব্যাপ্ত পরম চেতনা লাভ করেছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ তারা উপস্থাপন করতে পারে না। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না তাদের সামনে দেয়ালের ওপারে কি হচ্ছে, কিন্তু তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপী চেতনা লাভ করেছে বলে দাবী করে মিথ্যা গর্ব প্রকাশ করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ তাদেরও গভীরভাবে সাহায্য করবে। তা তাদের চক্ষু উন্মীলিত করে দেখাবে যে কেবল পরম চেতনার দাবী করার মাধ্যমেই পরম চেতনা লাভ করা যায় না। কেউ যদি সেরকম দাবী করে তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা কিন্তু স্থূল জড়বাদী এবং কপট পরমার্থবাদীদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন, এবং তাই তাঁরা চিন্ময় বিষয়ে বাস্তব সত্যকে মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে জানবার জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ৫১

সূত উবাচ

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ।
তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রী সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **পরীক্ষিতা**—পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **যৎ**—যা; **অবোচৎ**—বলেছিলেন; **মহামুনিঃ**—মহান ঋষি; **তৎ**—সেই বিষয়ে; **বঃ**—আপনাকে; **অভিধাস্যে**—আমি বিশ্লেষণ করব; **শৃণুত**—দয়া করে শ্রবণ করুন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **প্রশ্ন**—প্রশ্ন; **অনুসারতঃ**—অনুসারে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি যা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন বলব। দয়া করে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

যে কোন প্রশ্নের উত্তর যখন মহাজনদের উদ্ধৃতি দিয়ে উত্তর দেওয়া হয়, তখন তা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করে। আদালতেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। ভাল উকিল অধিক কষ্ট না করে তাঁর মামলা রুজু করার জন্য পূর্ববর্তী বিচারের প্রমাণ দিয়ে তাঁর সাক্ষ্য প্রস্তুত করেন। একে বলা হয় পরম্পরা প্রণালী, এবং বিচক্ষণ মহাজনেরা তাঁদের মনগড়া কদর্থ তৈরী না করে এই পন্থার অনুসরণ করেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

[ব্রহ্মসংহিতা ৫/১]

আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা, যিনি সর্বকারণের পরম কারণ এবং নিঃসন্দেহে সব কিছুই যাঁর অধীন।

ইতি—"শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য। দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।